শরৎ কথা

সুজিতকুমার নাগ
সম্পাদিত

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন : ৪০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলি-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীহিরণ মুখোপাধ্যায়
আধুনিক পুস্তক প্রকাশন
৪০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সহযোগী সম্পাদনা : সুধা নাগ

মুদ্রাকর :
শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক
শংকর প্রেস
৩৭/১/১, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সঙ্গী
বন্ধুদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অমর
কথাশিল্পীর জন্ম-শতবার্ষিকীর
শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচীপত্র

এই প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যের কমল বনে শরৎচন্দ্র একটি নাম। শুধু তাই নয় অমর কথাশিল্পীর সাহিত্য আমাদের বাংলা সাহিত্যের জাতীয় গৌরব। আমাদের পরম সৌভাগ্য তিনি আমাদের বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি তার সাহিত্য জীবন একসঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের কাছে বিস্ময়ের কারণ ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ দে তাঁর সম্পাদিত একটি সংকলন গ্রন্থে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করছি।

"শরৎচন্দ্রই একমাত্র মানুষ, যাঁর সাহিত্য ও জীবন একসাথে একাকার করে মিলিয়ে মিশিয়ে পাঠক সমাজ তাঁকে একটি কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে শরৎচন্দ্র বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিতে পেরেছিলেন বলে। তাঁর নির্ভেজাল আন্তরিকতা ও দরদের জন্য। কিন্তু একজন লেখক বা শিল্পীর অন্তরালে একজন ঘরোয়া মানুষও থাকে। শরৎচন্দ্রের মধ্যের সেই ঘরোয়া মানুষটির পরিচয় বহন করে আনলো এই সংকলনটি। শরৎচন্দ্রকে কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, পাশাপাশি কাটিয়েছেন এমন অনেক মানুষ-জনের লেখা এখানে পাওয়া যাবে। চেনা যাবে ঘরোয়া মানুষ শরৎচন্দ্রের ছবিটি। তাঁর সুখ-দুঃখ-ব্যথা বেদনার কাহিনী কি খেয়াল-খুশি-মান-অভিমানের ছবি এই সংকলনের লেখাগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্র যে একজন মহৎ কথাশিল্পীই ছিলেন না কেবল, মানুষ হিসেবেও বিরাট-হৃদয়, স্নেহশীল, দয়ালু—এ পরিচয় এই সংকলনের বহু লেখার মধ্যেই রয়েছে।"

এই সংকলন গ্রন্থখানি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। বিশেষ করে 'ভারতবর্ষ' (১৩৪৪) 'সাহানা' (১৩৪৪) 'বসুমতী' (১৩৪৪) বাতায়ন (১৩৪৭) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া নেপথ্য থেকে শ্রীভূপেন ভট্টাচার্য, শ্রীস্বপন ঘোষচৌধুরী, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীদিলীপ দত্ত আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। এরজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই সংকলন গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীহিরণ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা হল।

পাঠকবর্গের কাছে জানিয়ে রাখা ভাল ইতিপূর্বে আমার সম্পাদনায় শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ বের হয়েছে, সেইসব সংকলন গ্রন্থ থেকে এর বৈচিত্রতা স্বতন্ত্র। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই জানেন বইয়ের প্রচ্ছদই বইয়ের আসল চেহারা নয়।

সবশেষে আরেকজনের নাম উল্লেখ না করে পারলাম না, তিনি হলেন সুধা নাগ ; যাঁর প্রেরণায় ও আন্তরিকতায় এ গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

শরৎচন্দ্রকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কল্যানীয় শরৎচন্দ্র,

তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্য রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে, তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তারা কাল যা পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রস-তৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে

নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান না দিলে, পুরোনো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। আকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তারপর তেল ফুরিয়েছে, অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি। কেন না, আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝে বয়স যখন পেরিয়ে গেছে, তখনো যারা তার অভিনন্দন করে, তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউস ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন ধানের 'পরেও আগাম-দাবী রাখে। খুশী হয়ে বলে, মানুষটা এক ফসলা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহরতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত: যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালই, না থাকলেই ভাববার কারণ। এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময় মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না, এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কেন না রচনার উপর তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে, তাব সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব তার প্রশংসার দাম বেশী নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্য মা ছেলের নাম রাখেন

এককড়ি, দু'কড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি, দু'কড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষতারদ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রসংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরতের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম, যদি তাঁকে বলতে পারতুম, তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান পত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত। শুধু কথা সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবাছ জন্যে বাঙ্গালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙ্গালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার ছেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিষেশভাবে সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী

করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে শত্য করে দেখতে স্পষ্ট কার মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষেগুণে, ভালোয় মন্দয় —চমৎকার জনক শিক্ষাজনক কোন দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ-প্রাঞ্জল ভাষায়।

* শরৎ সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে এই পত্রটি পাঠিয়েছিলেন ২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩ সালে।

শ্রীকান্তের দেশে রাজু

হীরালাল দাশগুপ্ত

"সুরেন বাবুর (শ্রীসুরেন মুখোপাধ্যায়) আদি বাসস্থান ভাগলপুর। কথায় কথায় বললেন—শ্রীকান্ত পড়েছেন তো? ইন্দ্রনাথ কে জানেন? ও আমাদের রাজু। কি দুর্দান্ত ছিল এই ছেলে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কিন্তু ও খুব ভালবাসত। তাদের নিয়েও দস্যিপনার শেষ ছিল না। একবার আমাদের পরিবারের একটি ছোট মেয়েকে কোলে করে ও কোথায় চলে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ওকে যে অবস্থায় পাওয়া গেল, সে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। দু'টো বড় বড় গাছ। মাঝে অনেকটা ব্যবধান। ঐ দু'গাছে একটি দড়ি বেঁধে ঐ দস্যিছেলে খুকিকে নিয়ে বসে ছিল দড়ির মাঝখানে। না আছে কোন কাঠ, না কোন অবলম্বন। আমরা ভয়ে অস্থির। লক্ষ্মী সোনা ধন নেমে এস,—বলে কাতরে ওকে মিনতি জানাচ্ছি। শেষটায় এল। কিন্তু হঠাৎ পা ফস্‌কে গেলে কি বিপদই না হত!"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়েও এমনি দুরন্তপনায় অন্ত ছিলো না তার।

রাজুর নিজস্ব একটা ডিঙ্গি নৌকা ছিলো

সেই ডিঙ্গি বেয়ে নদীতে আপন মনে ঘুরে বেড়াতো সে।

শরৎচন্দ্র প্রায় সময়ই তার সঙ্গী হতেন এই সব অভিযানে। অনেক দূর পর্যন্ত চলো যোতো তারা। কোন কোন দিন বা ফিরতে অনেক রাত হয়ে যোতো।

গভীর নিস্তব্ধ রাতেও রাজুর বিশ্রাম ছিলো না।

দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করার জন্য তার রাতের অভিযান চলতো।

এমনি নিঃস্তব্ধ রাতে ডিঙ্গি নিয়ে জেলেদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নদীতে চলে যেতো মাছ ধরতে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাছ ধরতো। জেলেদের জাল পেতে রাখা মাছগুলো নিজের ডিঙ্গিতে তুলে তারপর সেই রাতের আঁধারেই আবার ফিরে আসতো নির্দিষ্ট জায়গায়। পরে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই মাছ রাত্রিতেই বিক্রি করে ফেলতো।

সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, সে টাকা কিন্তু নিজে আত্মসাৎ করতো না। ভোগ বিলাসেও ব্যয় করতো না

অকাতরে সাহায্য করতো। পাড়ার এবং আশে পাশে যত গরীব লোক [illegible] দের বণ্টন করে দিতো। দান করতো কোন কন্যাদায়-গ্রস্থ পিতাকে। এমনি বহু দুঃস্থলোক তার কাছে যথেষ্ট উপকার পেয়েছে।

এছাড়া রাজুর আরও অনেক কাজ ছিলো।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রোগীর সেবা করা, মৃতদেহ সৎকার করা, এধরণের বহুবিধ কাজই সে করে বেড়াতো।

এ হেন কাজে রাজুর একমাত্র সহচর কিংবা অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি সর্বতোভাবে সর্বকাজে তাকে সাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্র অবশ্য তখন ছাত্র ছিলেন। বাড়ীর নানাবিধ নিষেধ থাকা সত্বেও তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে যেতেন রাজুর সাথে।

রাজুর সঙ্গী হিসাবে শরৎচন্দ্রের পরোপকারমূলক কাজের একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীতে প্রত্যেক বছরই বেশ ধুম ধাম করে জগদ্ধাত্রী পূজা হতো। পূজার পর, কয়েক রাত্রি ধরে চলতো সেখানে যাত্রানুষ্ঠান।

একবার পূজার পরে এমনি যাত্রা হচ্ছিল।

বেশ জমাটে যাত্রা।

কলকাতা থেকে এসেছে যাত্রার দল। তখনকার দিনে বেশ নাম-ডাক ছিলো সেই দলের। সুন্দর জমে উঠেছে যাত্রা।

পাড়ার লোক তো বটেই, এমন কি আশ-পাশের গাঁয়ের লোকও এসে জড়ো হয়েছে যাত্রা শুনতে। আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন শরৎচন্দ্রও।

হঠাৎ আবির্ভাব ঘটলো রাজুর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের কাছে এলো। কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বললে, একবার বাইরে আয় শিগ্‌গীর।

কেন?

বাইরে আয় না, বলছি সব।

শরৎচন্দ্র আর কথা বাড়ালেন না। উঠে বাইরে এলেন। অকস্মাৎ রাজুর আবির্ভাবে তাঁকে খুবই কৌতুহলী করে তুলেছিলো। বললেন, কি ব্যাপার রে?

ব্যাস্তবাগীসের মতো রাজু আপসোস্ করে বললে, অনেক চেষ্টা করলাম, তবু বাঁচানো গেল না।

ব্যাস্ত হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, কাকে?

ও পাড়ার একটা ছোট ছেলে। মাত্র তিন বছরের।

কি হয়েছিলো?

কলেরা।

শরৎচন্দ্র চুপ করে গেলেন।

রাজু একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, একমাত্র ছেলে বাপ-মায়ের। ওরা তো অসম্ভব কান্নাকাটি করছে। কিন্তু কলেরার মড়া। বাড়ীতে ওভাবে ফেলে রাখাটা মোটেই উচিত হবে না।

কি করবি ?

তাই ভাবছি, এখনই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কে নিয়ে যাবে ? পাড়া যে একেবারে ফাঁকা। সকলেই যাত্রা শুনতে এসেছে। যাকৃগে তুই-ই চল আমার সাথে।

শরৎচন্দ্র আর কথা বললেন না। বিনা বাক্যে রাজুর সঙ্গে রওনা হলেন।

রাত্রি প্রায় একটা।

কলেরায় মড়া শিশুটিকে নিয়ে রাজু আর শরৎচন্দ্র দু'জনেই রাতের নিঃস্তব্ধতায় এসে উপস্থিত হলেন শ্মশানঘাটে।

এদিকে আরেক কাণ্ড।

গভীর রাত। নির্জন অন্ধকার শ্মশান। গঙ্গার তীর। প্রবল বিক্রমে বাতাস বইছে। চারিদিকে শুধু গাছের পাতার শন্ শন্ শব্দ।

গঙ্গার তীরে হঠাৎ দু'জনেরই চোখে পড়লো একজন গঙ্গা যাত্রী বৃদ্ধ একা পড়ে রয়েছে।

দু'জনেই এগিয়ে গেলেন কাছে।

রাজু চোখ দু'টো বড় বড় করে চারিদিকে লক্ষ্য করে বললে, এখানে একা পড়ে আছ কেন গো ? তোমার সঙ্গে কেউ নেই ?

বৃদ্ধ তাকালো। বললে, পড়ে আছি বাবা, কিন্তু মরণ আর হচ্ছে না। তিনদিন ধরে এভাবে পড়ে আছি। আমাকে নিয়ে এসেছে

পাড়ার দু'জন লোক আর আমার দুই নাতি। তারাও আমার সঙ্গে রয়েছে এখানে। কাছ কোথাও যাত্রা গান হচ্ছে তাই শুনতে গেছে তারা।

হঠাৎ কেঁাপিয়ে কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ।

তারপর আবার বললে, জান. তারা আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেছে। শুধু বলে, মরবে বলে বুড়োকে নিয়ে এলাম, এদিকে গঙ্গার হাওয়ায় দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বুড়ো। মরবার নামটি পর্যন্ত করছে না। আচ্ছা বাবা, এখানে গঙ্গা যাত্রী হয়ে এলে কি ঘরে আর ফিরে যাওবা যায় না ?

যায়—রাজু আশ্বাস দিয়ে বললে।

রাজু বললে, তুমি আর এখন মরবে না। এ যাত্রা রক্ষা পেলে ! কিন্তু তোমার বাড়ী কত দূর ?

পাশের গঁায়ে।

বেশ, তোমাকে আমার বাড়ী পৌছে গিয়ে আসবো। নইলে, তোমার সঙ্গীরা তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে নেই বলে গলা টিপেই মারবে।

সত্যি বলেছ বাবা। একথাই বলছে ওরা ! —বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখে কান্না জড়িয়ে এল আবার !

রাজু আশ্বাস দিয়ে বললে, কোন ভয় নেই আর। দাঁড়াও, আগে আমাদের কাজটা শেষ করি ! পরে আজ রাত্রির জন্য আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবো। সকালে তোমাকে পৌছে দেবো তোমার বাড়ীতে।

বৃদ্ধ ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো।

মাটিগর্ত করে মৃত শিশুটিকে চাপা দেওয়া হলো। গঙ্গায় নেমে ডুব দিলো দু'জনেই। তারপর উঠে এসে রাজু বৃদ্ধকে তুলে কাঁধে নিয়ে শরৎচন্দ্র ওর কাঁথা-বালিশ বগলদাবা করে নিয়ে এলেন।

আরেকবার রাজুর একটি দুঃসাহসিক কাজে শরৎচন্দ্র কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাই বলছি।

সন্ধ্যা তখনও ঠিকমতো হয়নি।

রাজু প্রত্যেক দিনের মতো সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলছিলো। হঠাৎ স্থানীয় হাইস্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

পণ্ডিত মশাই রাজুকে দেখতে পেয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, এই যে বাবা রাজু, আমি তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম।

পণ্ডিতমশাইকে এভাবে কাঁদতে কেউ কখনও দেখেনি। রাজু নিজেও না। সাধারণতঃ স্বল্পভাষী বলেই তাঁকে সবাই জানতো।

রাজু ব্যস্ত হয়ে বললে, কি হয়েছে আপনার? এভাবে কাঁদছেন কেন?

রাজুর কথায় পণ্ডিতমশায়ের কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

কি হয়েছে আপনার? বলুন?

তিনি নিজের পিঠ দেখিয়ে বললেম, দেখ বাবা, দেখ। আমাদের পুলিশ সাহেব বিনা কারণে আমাকে কেমন মেরেছে। টিউশনিতে যাচ্ছিলাম জমিদার বাড়ীতে। রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চড়ে যাচ্ছিলো ঐ পুলিশ সাহেব। দেখেই আমি রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালাম। তবু সাহেব রেগে গিয়ে আমায় ভীষণ গালাগালি করলো। তাতেও নিস্তার নেই। বললে, রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতে পার না—বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘোড়ার চাবুক দিয়ে বেদম মারলো আমায়। মার খেয়ে আমি পড়ে গেলাম মাটিতে। তখন সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল তার কুটীরের দিকে।

সব শুনে রাজু স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর বললে, বড্ড বাড় বেড়েছে সাহেব। আচ্ছা, ও

টের পাবে এবার। সাহেব বিলিয়ার্ড খেলতে গেছে ক্লাবে। ফেরার পথেই সে বুঝবে মজা। আপনি এখন বাড়ী যান। পরে সব শুনতে পাবেন।

পণ্ডিত মশাই চলে গেলেন।

এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে রাজু চলে এলো শরৎচন্দ্রের কাছে।

রাজুকে হন্তদন্ত ভাবে আসতে দেখেই শরৎচন্দ্র বুঝলেন একটা কিছু ঘটেছে। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রাজু?

রাজু বললে, এদিকে আয় বলছি।

শরৎচন্দ্র এগিয়ে আসতেই রাজু সমস্ত ঘটনাটা বললো তাঁকে। তারপর তাঁর হাতটা টেনে বললে, শিগ্‌গীর আয়।

কোথায়?

আয় না আমার সঙ্গে। সব বলছি।

শরৎচন্দ্র আর কোন সঙ্কোচ করলেন না। রাজুর সঙ্গী হলেন তিনি।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে গেলেন আমদপুরঘাটে।

শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, এখানে এলি কেন রাজু?

রাজু বললে, দরকার আছে। তুই দাঁড়া একটু এখানে। এক্ষুণি আসছি।

শরৎচন্দ্র দাঁড়ালেন।

রাজু হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল ঘাটের দিকে। আমদপুরঘাট। এই ঘাটে সে সময় রাত্রিতে ছোট বড় অনেক নৌকা বাঁধা থাকতো।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাজু এসে ঘাটে দাঁড়ালো। তারপর চুপি চুপি গিয়ে উঠলো একখানি বড় নৌকার উপর। সেখান থেকে মাঝিদের দৃষ্টি আড়াল করে এক সময় মোটা একটা প্রকাণ্ড কাঠির বাণ্ডিল মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসে হাজির হলো।

শরৎচন্দ্র কিছু প্রশ্ন করার আগেই বললে, কাঠির বাণ্ডিল নিয়ে এলাম। এবার ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে চল্।

প্রায় মাইল খানেক রাস্তা এগিয়ে এলেন দু'জনে। পথে চলতে চলতে তখন রাজু তার সমস্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করলো।

পুলিশ সাহেবের বাংলো আর বিলিয়ার্ড খেলার ক্লাব এ দু'টোর মধ্যে এক মাইলেরও বেশী দূরত্ব ছিলো। ওঁরা দু'জন যে পথাটায় এসে দাঁড়ালো সেই পথ দিয়েই ঘোড়া চালিয়ে যাতায়াত করতো সাহেব। উল্লেখযোগ্য যে, এই সাহেব কিছুতেই আস্তে ঘোড়া চালাতো না। যখনই পথে বেরুতো তখনই দ্রুতগতিতে চালাতো ঘোড়া।

শরৎচন্দ্র আর রাজু যে পথটায় এসেছে ওটা সাহেবের বাংলো আর ক্লাবের প্রায় মাঝামাঝি রাস্তা। ওরা দু'জনে কাঠির বাণ্ডিলসহ অন্ধকারে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

পুলিশ সাহেব খুব রাত করে ক্লাব থেকে ফেরেন। তাই কোন অসুবিধা নেই অপেক্ষা করার।

রাত বাড়লো।

অনেক রাত হওয়ায় রাস্তায় লোক যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গেল। তখন দু'জনে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে কাঠিটাকে রাস্তা থেকে হাত দুই উঁচু করে রাস্তার দু'দিকে দু'টো মোটা গাছে টান করে বেঁধে রাখলেন। ঠিক মতো কাজ সেরে দু'জনে আবার চুপি চুপি এসে বসে রইলেন। অন্ধকারে ঝোঁপের ভেতর।

এবার অপেক্ষার পালা।

সময় এগিয়ে চললো।

এক সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। খটাখট্…খটাখট্। ক্রমশই আওয়াজটা নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো।

শরৎচন্দ্র আর রাজু বুঝলেন, খেলা সাঙ্গ করে সাহেব বাংলায় ফিরছে।

দ্রুত ঘোড়া চালানোর উৎকট ব্যাধি অনুযায়ী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন সাহেব। ঠিক কাঠির কাছাকাছি এসেই ঘটলো অঘটনটা।

কাঠিতে ঘোড়ার পা জড়িয়ে সাহেব সুদ্ধ ঘোড়া উল্টে পড়লো। হঠাৎ উল্টে পড়ায় সাহেব মুখে প্রচণ্ড আঘাত পেল। তার উপর আবার সাহেব খুব নেশা করায় মাটি থেকে উঠতে পারছিলো না।

মুহূর্তে রাজুর মূর্তি পালটে গেল। সে হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো নেশায় মত্ত সাহেবের উপর। পড়েই তার পুষ্ট বাহু দ্বারা বেদম ভাবে মারলো সাহেবকে। এদিকে সাহেব উল্টে পড়ে এবং তার উপর প্রচণ্ড প্রহার খাওয়ায় তখন প্রায় অচৈতন্য। এরপর রাজু তার কোমর থেকে রিভবারটা খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তারপর তাড়াতাড়ি কাছিটা খুলে নিলো রাজু। খুলেই আগের মতো বাণ্ডিল করে মাথায় উঠিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন দু'জনে। সোজা এসে আদমপুরঘাটে হাজির হলেন। যায়গা মতো কাঠিটা রেখে রিভলবারটা ছুড়ে নদীর গভীর জলে ফেলে দিলো।

ব্যাস্।...একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র পা বাড়ালেন বাড়ীর দিকে।

---

* শ্রীভূপেন ভট্টাচার্য প্রণীত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র থেকে অংশ বিশেষ গৃহীত।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র

গিরীন্দ্রনাথ সরকার

"শহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন সে স্থানগুলির নাম 'বোটাটং' ও 'পোজোনডং'। রেঙ্গুন শহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডকইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে তাহাতে ফিটার, বাইশম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিলো একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক তিন চার টাকা রোজগার করে। ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত। ইহাদের জন্য এখানে সারি সারি অনেক কাঠের ব্যারাক বাড়ী এখনও আছে। শরৎচন্দ্র স্বল্প ভাড়ায় ঐরূপ একটি ছোট বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমি ঐ পল্লীর নাম 'মিস্ত্রী পল্লী'র পরিবর্তে 'শরৎ পল্লী' রাখিয়াছিলাম।

এ পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। তাহাদের চাকরির দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা

করিত এবং বামুন দাদা বলিয়া ডাকিত। এই বামুন দাদার প্রতি তাহাদের প্রভূত বিশ্বাস ছিলো। অনেকের টাকা কড়ির আদান প্রদান এই বামুনদাদার মারফতেই হইত।

ইহাদের একটি কীর্তনের দল ছিল। বামুনদাদার পরিচালনায় ছুটির দিন ইহারা খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করিত।"

শরৎচন্দ্র যে মিস্ত্রী পল্লীতে ছিলেন, সেখানে অনেকেই বাড়ীতে মদ খেতো। বিশেষকরে শনিবার হলে তো কথাই নেই। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা হলেই স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একসঙ্গে মদ খেয়ে পৈশাচিক কাণ্ড বাধাতো। চীৎকার, হৈ-হল্লার তো কথাই নেই।

বিশেষকরে পুরুষদের নেশার জের থাকতো দু'তিন দিন ও। ফলে অনেকেই সোম মঙ্গলবার পর্যন্ত কাজ কামাই করতো। কিন্তু নেশা যখন কেটে যেতো তখন কিন্তু সংসারের প্রতি তাদের চিন্তা ভাবনার অন্ত থাকতো না। অনেকেই ভয় পেতো, এই কামাইয়ের জন্য যদি চাকরি যায় তা হলে কি করবে! চাকরি যদি না ও যায় জরিমানা হলে ও তো আর্থিক ক্ষতি হবে তাদের।

নেশা কাটার পর অনুশোচনায় যখন তারা বিব্রত হয়ে উঠতো, তখনই কাতরভাবে এসে দাঁড়াতো শরৎচন্দ্রের কাছে। দরখাস্ত না লিখিয়ে নিয়ে কাজে যাবে কি ভাবে।

শরৎচন্দ্র তাদের এহেন কাজে ক্ষুন্ন হলে ও যখন ওদের ঐ অসহায় আর নিঃস্বভাব দেখতেন তখন ভীষণ কষ্ট পেতেন মনে। তাই প্রত্যেক-কেই দরখাস্ত লিখে দিতেন তিনি। পরে অনেক সময়ই তিনি তাদের বুঝিয়ে নিষেধ করতেন এসব নেশা করতে। কাজ ও হয়েছে অনেক-ক্ষেত্রে।

এই সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করছি—

শরৎচন্দ্রের বাড়ীর পাশেই সাধু নামে একজন মিস্ত্রী বাস করতো।

সে বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানীতে ফিটারের কাজ করতো। বয়স বেশী নয়। দেখতে মোটামুটি। তার প্রকৃত বাড়ী ছিলো উড়িষ্যায়। সে শরৎচন্দ্রকে সাক্ষাত দেবতা জ্ঞানে দেখতো। দাদাঠাকুর বলে ডাকে।

প্রতি শনিবারই তার ঘাড়ে চাপতো ভূত। সে এত বেশী পরিমাণে নেশা করতো যে দু'তিন দিন পর্যন্ত বেহুশ হয়ে থাকতো।

সপ্তাহের মধ্যে সোম মঙ্গল এ দু'দিন তো হামেশাই কামাই হতো তার। হুঁশ হতেই ছুটে আসতো শরৎচন্দ্রের কাছে।

দাদাঠাকুর ?

কে ? সাধু ?

হ্যাঁ, দাদাঠাকুর। শরীর খারাপ থাকায় দু'দিন কাজে যেতে পারে নি। একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে আমায়।

শরৎচন্দ্র বুঝতেন সব। 'তবু মুখে কিছু বলতেন না। তার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হতো তাঁর। নির্বিবাদে দরখাস্ত লিখে দিতেন।'

এমনি বার কয়েক লিখে দেবার পর একদিন শরৎচন্দ্র তাকে বললেন, সাধু, আর নয়। সামনের শনিবারে যদি ফের নেশা কর তবে কিন্তু খারাপ হবে। দরখাস্ততো লিখো দেবোই না, বরং তোমার সাহেবকে বলে তোমার চাকরি খতম করবো।

সাধু কেঁদে ফেললো।

শরৎচন্দ্র বললেন, কাঁদলে কি হবে বাপু, আমি অন্যায়কে তো আর সমর্থন করতে পারি না।

কাঁদতে কাঁদতেই সাধু বললে, চাকরি গেলে আমি বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাহারে মারা যাবো, দাদাঠাকুর। ও কাজ দয়া করে করবেন না। এই আমি ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি, আর কোনদিন নেশা করবো না।

সাধুর কথায় শরৎচন্দ্র খুশী হলেন। বললেন, বেশ, দেখবো তোমার শপথ কেমন থাকে।

সাধু কিন্তু তার শপথ সত্যি রেখেছিলো। শরৎচন্দ্র যতদিন রেঙ্গুনে ছিলেন, কোন দিন আর তাকে নেশা করতে দেখেননি।

পল্লীর মিস্ত্রীরা সাধারণত অশিক্ষিত। তাই তারা বিপথগামী হলে তাদের অনেক চেষ্টা করতেন সৎপথে ফিরিয়ে আনতে। শুধু অশিক্ষিতই বা কেন, তিনি তার পরিচিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন।

শরৎচন্দ্র হার মেনেছিলেন শুধু একটি ক্ষেত্রে।

একজামিনার পাবলিক ওয়াকর্স একাউণ্টসে যখন শরৎচন্দ্র চাকরি করতেন, সে সময় ত্রৈলোক্যনাথ বসাক নামে তার একজন সহকর্মী ছিলেন। এই ত্রৈলোক্যবাবুর এক স্ত্রী ছিলেনে দেশে। পরে বর্মায় এসে তিনি একজন বার্মি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাকে সংশোধন করতে। কিন্তু কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। সেজন্য প্রায়ই তিনি তাঁর অফিসের অন্যান্য সহকর্মিদের আক্ষেপ করে বলতেন, কত লোকের কাঁধ থেকে ভূত নামিয়েছি, শেষটায় ত্রৈলোক্যবাবুর কাছেই হারতে হল আমাকে।

ব্রহ্মদেশে থাকার সময় শরৎচন্দ্র শুধু দুঃস্থ বাঙ্গালীদেরই সাহায্য করেছেন এমন নয়, তিনি বহু গরীব বার্মীকেও একইরূপ সাহায্য করেছেন। অাভাবগ্রস্ত প্রতিটি লোলোর জন্যই তাঁর কোমল হৃদয় হাহাকার করতো।

শ্রীভূপেন ভট্টাচার্য প্রণীত 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' থেকে গৃহীত।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাবার পর, সেখান থেকে প্রথম বাংলাদেশে আসেন সম্ভবতঃ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় তিনি তিনমাসের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলেন।

এরপর এসেছিলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এ সময় ছুটি নিয়ে এসেছিলেন একমাসের। তখন তিনি হাওড়া ময়দানের কাছে একটা বাড়ীতে ছিলেন।

তখন হাওড়া থাকাকালে একদিন শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন দেখা করতে। শরৎচন্দ্র তখন ঘরের মেঝেতে বসে লিখছিলেন।

উপেন্দ্রনংথকে ঘরে ঢুকতে দেখে শরৎচন্দ্র খুবই অবাক হয়েছিলেন। কারণ, তিনি যে কোলকাতায় এসেছেন এ সংবাদ একমাত্র তাঁর ভাই প্রভাসচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ জানতেন না।

মাতুল উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে বিস্মিত হতে দেখে হেসে বলেছিলেন, তোমার ঠিকানা না জানিয়ে এ ভাবে অজ্ঞাতবাসের অর্থ কি? প্রভাসের কাছে ঠিকানা না পেলে দেখাই হতো না।

শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, কেমন আছ? কি লিখছিলে?

শরৎচন্দ্র হেসেই বললেন, ভাল। বসে বসে 'চরিত্রহীন' নামে

একটা উপন্যাসের শেষটুকু লিখছিলাম।—এই বলে তিনি পাণ্ডুলিপি খানা উপেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

পাণ্ডুলিপি খানা হাতে পেয়ে উপেন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। একটু পরে শরৎচন্দ্র তাঁকে প্রশ্ন করলেন, পড়তে কেমন লাগছে?

উপেন্দ্রনাথ খুশী হয়ে বললেন, খুব ভাল লিখছ। এই বলে তিনি আবার পড়ায় মন দিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, এক কাজ কর। পাণ্ডুলিপিটা বাড়ীতে নিয়ে সবটা পড়ো। দু'দিন পরে ফেরৎ দিলেই চলবে। তবে হ্যাঁ, পড়ে কেমন লাগলো জানতে হবে আমাকে।

উপেন্দ্রনাথ খুশী হলেন একথা শুনে। বললেন আচ্ছা।

তারপর কিছুক্ষণ সময় অনেক গল্প করলেন দু'জনে। বাংলা দেশের গল্প থেকে রেঙ্গুনের গল্প কিছুই বাদ গেল না সেদিন।

উপেন্দ্রনাথ বাড়িতে ফিরে সে রাত্রেই পড়ে শেষ করলেন পাণ্ডু-লিপিটা। পড়ে মুগ্ধ হলেন। বিশেষ করে কতকগুলো অংশ তাঁর এত ভাল লাগলো যে পরেরদিন সকালে ও বাকী অংশ গুলো বার কয়েক পড়লেন।

সে সময় বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সুযোগ সম্পাদক ও খ্যাত-নামা সমালোক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। উপেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, 'চরিত্রহীন' পাণ্ডুলিপিটা তিনি তাঁকে দেখাবেন।

তাই হলো। দুপুরের পর উপেন্দ্রনাথ চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন সুরেশবাবুর বাড়ীতে তাকে পাণ্ডুলিপি খানা পড়তে দিলেন।

সুরেশবাবু পড়তে পড়তে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললেন, চমৎকার লেখা এটা?

উপেন্দ্রনাথ বললেন, বড়দিদির লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতী পত্রিকায় ঐ লেখাটা ছাপা হবার পর থেকেই শরৎচন্দ্রের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। 'এরপর কথা প্রসঙ্গে সুরেশবাবু জানেতে পারলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মীয় এবং রেঙ্গুন থেকে এসে হাওড়ায় উঠেছেন।

সুরেশবাবু বললেন, আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে চাই কালই যেন আমার এখানে আসেন। আর এ কথা জানাবেন, আমি বাংলা দেশের একজন শক্তিমান লেখককে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উপেন্দ্রনাথ রাজী হলেন সুরেশবাবুর কথায়।

পরদিন একরকম জোর করেই উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এলেন সুরেশবাবুর বাড়ীতে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হলে সুরেশবাবু তাঁর 'চরিত্রীহীন' পাণ্ডুলিপির উচ্চ প্রশংসা করলেন। কি তাঁর পত্রিকায় ঐ উপন্যাস ছাপতে সাহসী হলেন না। শুধু বললেন, আপনার এই অপূর্ব লেখা ফেরৎ দিলাম বটে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে অন্য লেখা কিছু দিতে হবে।

উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পাণ্ডুলিপি খানা ফেরৎ নিয়ে এলেন। শরৎন্দ্রেকে বিদায় দেবার সময় উপেন্দ্রনাথ তাঁকে আগমীকাল তার ভবানীপুর বাড়ীতে দেখা করতে অনুরোধ করলেন।

শরৎ সম্মতি জানিয়ে হাওড়া চলে গেলেন।

উপেন্দ্রাথবাড়ী ফেরার পথে স্থির করলেন যে, সাহিত্য পত্রিকায় যখন 'চরিত্রীহীন' ছাপা হলো না, তখন 'যমুনা' পত্রিকায় ছাপা হলে মন্দ হবে না। বরং যমুনার উন্নতি হবে।

ফণীন্দ্রনাথ পাল ছিলেন 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক এবং উপেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। একই পাড়ায় থাকতেন।

বাড়ী ফিরেই উপন্দ্রনাথ গেলেন যমুনা পত্রিকার অফিসে।

ফণীবাবুকে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কথা বললেন। আরও বললেন, শরৎচন্দ্র আগামীকাল আসবেন।

ফণীবাবু ভারতীতে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়েছিলেন। তাই এই সংবাদে তিনি খুব খুশী হলেন।

পরেরদিন শরৎচন্দ্রকে আসতে উপেন্দ্রনাথ ফণীবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেষে ফণীবাবু ও উপেন্দ্রনাথ দু'জনেই বিশেষ অনুরোধ করলেন যাতে যমুনায় চরিত্রহীন ছাপা হয়।

যমুনায় চরিত্রহীন ছাপতে শরৎচন্দ্র রাজী হলেন।

শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের রচনাগুলো ছিলো সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। উপেন্দ্রনাথ একথা জানতে সুরেনবাবুর কাছ থেকে কিছু কিছু লেখা চেয়ে আনেন। 'বোঝা নামে একটি গল্প দিলেন যমুনাকে। সেই গল্প যমুনার ১৩১৯ সালে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এই তিন সংখ্যায় ছাপার অক্ষরে বেরোয়।

উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আরও দু'টি রচনা দিলেন সুরেশবাবুকে রচনা দু'টির নাম 'বাল্য স্মৃতি' ও কাশীনাথ'।

'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যায় 'বাল্যস্মৃতি' ছাপা হয়। আর 'কাশীনাথ' ছাপা হয় ঐ বছরের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায়।

এর কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র নিজে রেঙ্গুন থেকে যমুনার জন্য দু'টো লেখা পাঠালেন। রচনা দু'টি হলো,—'রামের সুমতি' ও নারীর মূল্য'। প্রথমটি গল্প দ্বিতীয়টি প্রবন্ধ।

'রামের সুমতি' গল্পটি শরৎচন্দ্রের নিজের নাম ছাপা হয়েছিলো। আর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিলো তাঁর দিদি অনিলা দেবীর নামে। জানা যায়, শরৎচন্দ্র যত প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখেছেন তা সবই তাঁর ছদ্মনাম হিসাবে দিদি অনিলা দেবীর নামই বরাবর ব্যবহার করতেন।

এরপর ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ও শ্রাবণ সংখ্যা যমুনায় শরৎচন্দ্রের আর দু'টি লেখা 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুরছেলে' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো।

এভাবে পর পর কয়েকটি লেখা যমুনায় প্রকাশিত হলে পাঠক যখন যমুনার বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো' শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের ঠিক সে সময় কোলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁদের এই পত্রিকা বার করার তোড়জোড় করছিলেন।

এই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের পিছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে।

'ইভ্‌নিং ক্লাব' নামে তখন কোলকাতায় একটা বেশ নাম করা ক্লাব ছিলো। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন সম্পাদক। ঐ ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

একদিন ক্লাবের এক সভায় প্রমথবাবু প্রস্তাব করলেন, ক্লাবের একটা মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার। কিন্তু প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য হয়ে যায় ব্যয়সাধ্য বলে। সে সময় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় জানালেন, তিনি তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে জাঁক করে একটা মাসিক পত্রিকা বার করতে পারেন যদি সম্পাদকের দায়িত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদক হতে সম্মত হলেন।

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে হরিদাসবাবুদের প্রতিষ্ঠান 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হবার মাত্র কয়েকদিন আগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু হয়। এরপর

'ভারতবর্ষের' যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলেন জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা বার করার ব্যাপারে হরিদাসবাবুর প্রধান সহায়ক ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য। এই প্রমথনাথ ভট্টাচার্য আবার শরৎচন্দ্রের বহুদিনের পুরাতন বিশিষ্ট বন্ধু।

এদিকে শরৎচন্দ্রের পর পর কয়েকটা লেখা যমুনায় প্রকাশিত হয়েছে। আবার নতুন বিজ্ঞাপন, শরৎচন্দ্রের অপূর্ব উপন্যাস 'চরিত্রহীন' যমুনায় ধারাবাহিক ভাবে বেরুবে।

তখন কোলকাতার অনেক কাগজের মালিকই ফণীবাবুর উপর ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রধান সহায়ক প্রমথনাথ ভট্টাচার্য যমুনায় চরিত্রহীন ছাপা হবে শুনে বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি অনেক কষ্টে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন, ভারতবর্ষের ন্যায় একটা বৃহৎ কাগজে যেন তিনি তার 'চরিত্রহীন' উপন্যাস ছাপাতে অনুমতি দেন। এছাড়া অন্যান্য লেখাও যাতে ভারতবর্ষে পাঠান সে অনুরোধও করলেন।

আবার 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যমুনার শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' ও 'নারীর মূল্য' পড়ে খুব মুগ্ধ হন। পূর্বে তিনি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়েছিলেন। এবার তাকে অনুরোধ করে চিঠি দিলেন, তিনি তার 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটা ছাপতে চান।

শরৎচন্দ্র পড়লেন মহাচিন্তায়। কি করবেন এখন তিনি। একদিকে 'যমুনা' অপর দিকে ভারতবর্ষ'। আবার 'সাহিত্য' ও অনুরোধ করেছে।

অনেক চিন্তাভাবনার পর শরৎচন্দ্র ঠিক করলেন, যমুনায় তার পর

পর কয়েকটা লেখা ছাপা হয়েছে। সাহিত্যেও তাই। সুতরাং তাদের যদি তিনি 'চরিত্রহীন' না দেন তবে তারা ততটা দুঃখিত হবেন না। যতটা তার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু প্রমথ হবে।

এই ভেবে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষেই 'চরিত্রহীন' দেবেন স্থির করলেন। কয়েকদিন পরে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটা প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তখন ভারতবর্ষের হিতৈষী বন্ধুগণ শরৎচন্দ্রের সেই পাণ্ডুলিপিটার কিছু অংশ পড়েই সেটা বাতিল করে দিলেন। তাদের ধারণা, একটা নতুন কাগজে ঐ ধরণের লেখা ছাপা হলে ফল খুব শুভ্র হবে না।

এই কথা জানতে পেরে শরৎচন্দ্র সেই পাণ্ডুলিপি ফেরৎ চেয়ে সে সময় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন,—

"....আমি জানিতাম' ওটা আমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে কথা পূর্বপত্রে লিখিয়াও ছিলাম। তবে এ সম্বন্ধে আমার একটু বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া মেসের ঝিকে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাহিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছে প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।.......এ একটা 'সাইন্টিফিক্ সাইকোঃ এণ্ড এথিক্যাল নভেল'। আর কেউ এরকম করিয়া বাংলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এতেই ভয় পেলে ভাই? কাউন্ট টলষ্টয়ের 'রিসারেকশন' পড়েছ কি? 'হিজ বেষ্ট বুক'। একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া লেখা। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই, সে কথা সত্য।...তোমাদের প্রথম সংখ্যার জন্য কি দিব ভাই? কি রকম চাও একটু লিখে জনোলে বড় ভাল হয়। আমার যথা সাধ্য করিব।"

এরপর প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের অনুরোধে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের জন্য 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসটি পাঠালেন।

এই 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসই ১৩২০ সালে ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা। পৌষ ও মাঘ দুই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো।

তারপর ১৩২১ সালে ভারতবর্ষে পরপর ছাপা হয়েছিলো শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই', 'অঁাধারে আলো', 'দর্পচূর্ণ' ও 'মেজদিদি' এরপর থেকে শরৎচন্দ্রের প্রায় রচনাই ভারতবর্ষে ছাপা হতে লাগলো।

সে সময় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অর্থে ও পরিচালনায় 'বঙ্গবাণী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিলো। সম্পাদক হিসাবে ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার।' অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন কর্মসচিব।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'মহেশ'। সে বছরেরই শেষ দিকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। গল্পগুলো উৎকৃষ্ট হওয়ায় পুনরায় গল্পের জন্য রমাপ্রসাদবাবু নিজে একদিন শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে যান। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন।

'বঙ্গবাণীর' জন্য রমাপ্রসাদবাবু লেখা চাইলে শরৎচন্দ্র বললেন, নতুন কোন লেখা নেই। ভারতবর্ষের লেখাই ঠিক সময়ে দিতে পারছি না।

শরৎচন্দ্রের কথায় রমাপ্রসাদবাবু হতাশ হলেও লেখা নেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই তার লেখবার টেবিলে গিয়ে খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ একটা খাতায় অসমাপ্ত লেখা চোখে পড়তেই তিনি বললেন, আপনি বললেন লেখা নেই, এই যে রয়েছে খাতায় ?

হাসলেন শরৎচন্দ্র। বললেন, এ লেখা তোমরা কেন, কেউ ছাপতে সাহস পাবে না। তাই অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছি।

রমাপ্রসাদবাবু বললেন, কেউ সাহস পাক আর না পাক, আমায় দিন, ছাপবো।

শরৎচন্দ্র বললেন, বিপদ হতে পারে। এমন কি জেলও।

দৃঢ়ভাবে রমাপ্রসাদবাবু বললেন, হোক, আমিই ছাপবো কাগজে।

খুশী হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, তবে তোমাকেই দেবো। এই উপন্যাসের নাম 'পথের দাবী'। বড় উপন্যাস। ক্রমশঃভাবে অনেক দিন চলবে।

১৩২৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'পথের দাবী' বেরোতে লাগলো।

'পথের দাবী' উপন্যাসখানি কোন প্রকাশকই হুবহু ছাপতে রাজী হচ্ছিলেন না। এদিকে শরৎচন্দ্রও একবর্ণ ওলটপালট করতে রাজী নন। সে সময় রমাপ্রসাদবাবু বইটা ছাপতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে শরৎচন্দ্র তাঁকে প্রকাশের অনুমতি দিলেন।

১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে 'পথের দাবী' পুস্তকের আত্মপ্রকাশ করলো। প্রকাশক হিসাবে নাম রইলো উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের।

'পথের দাবী' প্রকাশিত হলে গর্ভরমেণ্ট উপন্যাসের লেখক প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযোগ আনার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর স্যার তারকনাথ সাধুকে নির্দেশ দেয়।

তারকনাথ সাধু ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী মানুষ। সে জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এ ছাড়া তিনি আবার আইন ব্যবসায়ী, সুতরাং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেও যথেষ্ট ভক্তি করতেন বলে তাঁর ছেলেদের দেখতেন সম্মানের চোখে। এ সব কারণে তারকনাথবাবু নিজে বুদ্ধি করে গভরমেণ্টকে জানালেন, 'পথের দাবী'র লেখক শরৎচন্দ্র এখন বাংলার সব থেকে জনপ্রিয় উপন্যাসিক, আর উমাপ্রসাদ হলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

ছেলে। অতএব, তাঁদের কোন শাস্তি দিলে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই হবে বেশী। আমার বিশ্বাস, গভরমেণ্ট যদি লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে শাস্তি না এনে কেবল মাত্র উপন্যাসখানি বাজেয়াপ্ত করলেই হবে উপযুক্ত কাজ।

পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথবাবুর যুক্তিপূর্ণ রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত গভরমেণ্টকে মেনে নিতে হলো। তাই লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে অব্যাহতি দিতে গভরমেণ্ট শুধু বইখানা বাজেয়াপ্ত করলো।

বাজেয়াপ্ত হওয়ায় বইখানি আর ছাপা সম্ভব হয়নি উমাপ্রসাদ বাবুর পক্ষে। তবে বাংলার সে সময়কার বিপ্লবীদের প্রচণ্ড উৎসাহে এবং উদ্যোগে কোন এক অজ্ঞাত প্রেস থেকে বইখানা ছেপে গোপনে চারিদিকে বিক্রি হয়েছিল এ কথা সত্য।

এই লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন সুধা নাগ "কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র" গ্রন্থ থেকে

শরৎচন্দ্রের দয়া

জলধর সেন

শরৎচন্দ্র তখন শিবপুরে বাস করতেন।

একদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন রবিবার।

আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আট-নয়টায় কলিকাতায় ফিরে আসতাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোটবড় কলের ধুতি, শাড়ী ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে।

শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সুমুখের টেবিলে আনি-দুয়ানি সিকি গণে গণে গোছাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই বললেন—দাদা, আমি এই দশটার গাড়ীতে দিদির বাড়ী যাব। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।

আমি বললাম—দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছে, আর কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দুয়ানি?

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন—না দাদা, দিদির ব্রত প্রতিষ্ঠা নয়।

এই বলেই সে চুপ করল।

আসল কথাটাই গোপন করাটাই তার ইচ্ছা। আমি বললাম, ব্রত প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নতুন কাপড়ইবা নিয়ে যাচ্ছ কেন? অত সিকি দু' আনিরইবা কি দরকার?

শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন, দাদা দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের যে কি দুর্দশা। তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই—সে যে কি....

শরৎ আর বলতে পারল না, তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।"

॥ দুই ॥

শরৎচন্দ্র কুকুরটির ভেলু নামাকরণ কেন করেছিলেন জানিনে।

কুকুরটি দেখতে ছিলো কদাকার। আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র।

যে কেউ শরৎচন্দ্রের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত, শরৎ দর্শন প্রার্থী-বৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থে পিছিয়ে পড়তেন।

ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্যে থেকে যেই বলতেন—"এই ভেলু" আর অমনি মেষশাবকের মতো দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসত।

শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালোবাসতেন তা আর বলতে পারিনে।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল বাড়ীতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন।

দু' হাতে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন পাঠিয়ে দিলেন না।

ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচেছিল, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন।

সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতেন।

কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃতদেহ শিবপুরে নিয়ে সমাধিস্থ করলেন।

আমি সংবাদ পেয়েই সেই দিনই শিবপুরে গেলাম।

আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—"দাদা, আমার ভেলু আর নেই। তাঁর মুখে দিয়ে আর কথা বের হল না।

ভারতবর্ষ ১৩৪৪।

ভারতী ও শরৎচন্দ্র

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

১৩৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীয় সম্পাদিকা সরলাদেবী লাহোর থেকে কোলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয় নি। তিনি এসেছিলেন তারতী প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তার শিশুপুত্র দীপকের অন্নপ্রাশন দেবেন বলে। আমি তখন বি, এ পাশ করে এটর্ণীর আর্টিকেল আছি এবং ল' পড়ছি।...

একদিন দীনেশ চন্দ্র সেন এসে আমায় পাকড়াও করে সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে বললেন,—এর হাতে ভারতীয় ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন।

সরলাদেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং তখন বৈশাখ মাসের কপি তৈরীর জন্যে আমাকে বললেন—একটি মাঙ্গলিক কবিতা এবং একটি ছোটগল্প লিখে দাও।

তার হাতে দু'চারটি রচনা ছিল—ইংরেজী ভাষায় লেখা। সেগুলোর তর্জমার ব্যবস্থা হল। কিন্তু উপন্যাস চাই।

সরলাদেবী বললেন, ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কেউ ভারতীর জন্য লেখা দেবেন না। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে।

আমার মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের বড়দিদির কথা। আমি বললাম,

উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু'তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা।

সরলাদেবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে।

পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, চমৎকার, এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে তিন মাসে ছাপাও।

বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখকের নাম দিওনা।

সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদের দেরীর ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক গ্রাহিকা বাড়বে।

আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।"

সমস্ত কাজ সরলাদেবীর নির্দেশ মতো হলো।

বৈশাখ সংখ্যায় বড়দিদি ছাপা হওয়া মাত্র বাজারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। অপূর্ব লেখা।

ভারতীর বৈশাখ সংখ্যা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি দুঃখ করে বললেন, আপনি বললেন আর উপন্যাস লিখবেন না, অথচ এইতো ভারতীর জন্য উপন্যাস লিখেছেন। পত্রিকাটি আমার সঙ্গেই রয়েছে।

শৈলেশবাবুর কথাশুনে রবীন্দ্রনাথ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, অবাক হয়ে বললেন, দেখি পত্রিকাটা।

পত্রিকাটা হাতে নিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৈশাখ সংখ্যায় যতটুকু 'বড়দিদি' ছাপা হয়েছে পড়লেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, লেখাটা আমার নয়। তবে এটা বলা যেতে পারে, যিনি লিখেছেন তিনি খুবই শক্তিশালী লেখক।

ভারতীর কার্য্যালয়ে অনেকেই এসে জিজ্ঞেস করেন 'বড়দিদি'র লেখক কে?

কাউকেই স্পষ্ট করে কিছু বলা হলো না। হেসে বললে, একটু ধৈর্য্য ধরুন। লেখার শেষটায় লেখকের নাম অবশ্যই ছাপা হবে।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতেও লেখকের নাম দেওয়া হলো না তবু কাগজের চাহিদা বেড়ে গেল।

সে বছর আষাঢ় মাসের ভারতী বেরুতে দেরী হলো। বেরুলো গিয়ে পূজার পর। আর 'বড়দিদি' উপন্যাসের নীচে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অজস্র পাঠক পাঠিকাদের প্রশ্ন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে? কি তার পরিচয়।

এমন কি আষাঢ় সংখ্যা দেখে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্র নাথ প্রত্যেকেই আমার কাছে লেখকের সমস্ত কথা শুনে বলেছিলেন, 'বড়দিদির' লেখককে অসাধারণ শক্তিশালী এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তোমরা যে করেই হোক তার অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে সাহিত্যের আসরে টেনে আনতে পারবে না?

সেদিন শুধু বলেছিলাম চেষ্টা করবো।

গল্পকার শরৎচন্দ্র

সুকুমার সেন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যখন ইস্কুলে পড়ি। শরৎচন্দ্রও সেইমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছেন। থার্ড ক্লাসে কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। অন্য ইস্কুল থেকে এক নতুন সহপাঠী এলেন। এঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য হল। একদিন এঁদের বাড়ী গিয়ে দেখলুম অনেক মাসিকপত্র নেওয়া হয়। তার মধ্যে কতকগুলির নাম পর্যন্ত আমার অজানা ছিল। ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে থেকেই আমি বেজায় গল্পখোর। ইস্কুলে ঢুকে সে নেশা বাড়ল বই কমল না। তখনকার দিনে নতুন নতুন গল্প উপন্যাস টাট্‌কা পড়তে গেলে মাসিক পত্রের দ্বারস্থ হতে হত। ভারতী, সাহিত্য ও প্রবাসী এই তিনটি কাগজ নিয়মিত ভাবে পড়তুম। পরে অবশ্য এই লিষ্টে ভারতবর্ষ, মানসী ও সবুজপত্র যোগ হয়েছিল। সহপাঠী বন্ধুর ঘরে দেখলুম গল্পলহরী, মালঞ্চ, যমুনা ইত্যাদি ইত্যাদি। রীতিমত ভোজের আয়োজন। বন্ধুর অনুগ্রহে এ ভোজ থেকে বঞ্চিত হলুম না। যমুনায় পেলুম রামের সুমতি, পথনির্দেশ, পরিণীতা ইত্যাদি গল্প। পড়ে চমকিত হলুম। লেখকের নাম তো অপরিচিত। এতদিন ইনি ছিলেন কোথায় ?

যে বয়সে শরৎচন্দ্রের লেখা সব চেয়ে অভিভূত করতে পারে ঠিক সেই বয়তেই এঁর লেখা আমি প্রথম পড়েছিলুম। তখনি বুঝেছিলুম

যে ইনি গল্প লিখতে পারেন বটে। তার পরে ভারতবর্ষে ও অন্য পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে গেছি। বেশ ভালোও লাগত। কিন্তু সেই কৈশোরের প্রথম ভালোলাগার মত লাগেনি। এখন একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

শরৎচন্দ্র পাকা গল্প লিখিয়ে। একদা আমাদের দেশে গল্প বলা একটা শিক্ষাকর্মের মত ছিল। লেখায় সেকাজে সিদ্ধকাম হলেন শরৎচন্দ্র। এইটেই এঁর সাহিত্য-কীর্ত্তির প্রসঙ্গে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি। যেখানে শরৎচন্দ্র গল্প বলার অবকাশ পেয়েছেন সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী। আর যেখানে তত্ত্বকথা বলতে গেছেন সেখানে গল্পের খেই হারিয়ে যেন দিশাহারা হয়ে ঘুরছেন। এ দোষ-গুণের কথা নয়। শরৎচন্দ্র তত্ত্বকথা বলতে গেছেন ইচ্ছা করেই।

বাঙালী চিরকিশোরের জাত। চিরকিশোর শরৎচন্দ্রের গল্পরস সে যুগে যুগে পান করবে।

শরৎসাহিত্যের মূল্য নির্ণয়

রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রায় কুড়ি বছর হ'ল শরৎচন্দ্রের তিরোধান ঘটেছে। যেকালে তার তিরোধান ঘটে, সেই সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সাহিত্য বিচারের খুব মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য এই কালের মধ্যেও শরৎসাহিত্যের কিছু কিছু সমালোচনা হয়েছে। সম্ভবত শরৎসাহিত্য বিচারের আর একটি নূতন লগ্ন আজ এসেছে। প্রথম পর্যায়ের সমালোচমাগুলিতে শরৎসাত্যিরে কতকগুলি প্রাথমিক সত্যের আলোচনা আছে। শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মোহকে কাটিয়ে ওঠা তখনও সম্ভব হয় নি। অবশ্য একটু দূরকালের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মোহ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আজকের দিনে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় অথবা পার্থক্য নির্দেশ করাই শরৎসাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হবে না, শরৎচন্দ্রের প'' বর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যের বিচিত্র ধারার সঙ্গেও তার সংযোগের সূত্রটি আবিষ্কার করতে হবে। সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বিচিত্র পরিবর্তনশীলতার উপল-বন্ধুর পথ বেয়েই তার যাত্রাপথের নিশানা। তাই সাহিত্যের মূল্য-বিচারও স্থবিরের মতো তার চিরভ্যস্ত জায়গাটিতে চিরকাল বসে থাকতে পারে না।

তাই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই শরৎসাহিত্যের নূতন মূল্য-নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়।

উনিশ শতকের শেষদশক ও বিংশ শতকের প্রথম দশকের কথা-সাহিত্যের আবহাওয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোট গল্পের সাধারণ ভূমিকা গ্রামীণসমাজ জীবন ও গ্রামকেন্দ্রিক জীবনের নিখুঁত ছবি তার কাহিনীগুলির প্রাণরস। গ্রাম্য দলাদলি কৌলীন্য প্রথা, সহজ সরল গ্রাম্য প্রেম, পারিবারিক কলহ, ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি বিষয় শরৎ-সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। অন্ততঃ তার প্রথম দিকের রচনা-গুলির মধ্যে এই জীবনের স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। গ্রামীন জীবনের অবক্ষয় ও রক্তহীন পাণ্ডুরতার মর্মস্পর্শী বর্ণনা তাছে সত্য, কিন্তু রোমান্সের শেষ গন্ধটুকু তখনও নিঃশেষিত হয় নি। এক সময় রবীন্দ্র-নাথও বাংলা কথাসাহিত্যের এই রূপটির কথা অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন। তিনি এসময়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন: 'শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরেরর পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা এরি মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ-মিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীব-স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।" উনিশ শতকের শেষদিকের বাংলা গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাসের মূলসুরটির কথাই রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন।

কিন্তু এই সময়ের সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনের রূপচিত্রন অনেক সময়, ব্যাহত হয়েছে। তার প্রধান কারণ হলো আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার উদ্ভাবন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ফুলদানি' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন উপন্যাসের এই ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। আসল কথা ইতিহাসশ্রেয়ী রোমান্সের মোহ কাটিয়ে ওঠা তখনও সম্ভব ছিল না—তাই গ্রামকেন্দ্রিক সমাজশ্রয়ী

উপন্যাসের গঠন-রীতির মধ্যে তার ছাপ আছে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের নূতনত্ব। তিনি সুলভ রোমান্সের অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিক সংগঠন কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেক—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। তাই কাহিনীর মোড় ঘোরানোর জন্য তাঁর কোন ভোজবাজী সৃষ্টি করতে হয় নি তার সঙ্গে মানবীয় সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। রোমান্সের জটাজুটের মধ্যে আধুনিক কথাসাহিত্যের যে সম্ভাবনা আত্মগোপন করে ছিল, তাকে তিনি জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দিলেন। নব্যতন্ত্রী কথাসাহিত্যের মর্মবাণী তাই তাঁর রচনায় বিদ্যুতের লেখায়ফুটে উঠল। উনিশ শতকের বাংলা সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে বাল্যলিবাহ, বিধবা বিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ও পারিবারিক বিরোধের যে ভূমিকা ছিল তাকে তিনি অধিকতর বাস্তবরূপের মধ্যে নিয়ে এসে তার সম্ভাবনা ও ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দিলেন। সমাজ বিগর্হিত প্রেমের যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন, তাকে তিনি একটি নিসংশয়িত সত্যের সম্মূখীন করলেন। একসময় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন : "শরৎচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহা নীট্‌শের ভাষায় Transvaluation of Values, দরের হেরফের,যার ফলে যাহা ছোট ছিল তাহা বড় হইয়া গিয়াছে, যাহা অনাহত ছিল তাহা গৌরবের আসন পাইয়াছে।"

কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরে মূল্য-পরিবর্ণনের পালা আবার এসেছে। সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাও পরিবর্তিত হয়েছে। সামাজিক বিধিনিষেধ ও ব্যাক্তি জীবনের আশঙ্খা—এই দুয়ের নিরন্তর দ্বন্দ্ব শরৎসাহিত্যের পটভূমি রচনা করেছে। শরৎচন্দ্রের সমাজ আর নেই তেমনি বাক্তির স্বরূপ ও সংগ্রামক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয়েছে। সহর ও পল্লীর ব্যবধান আজ যেমন উৎকট হয়ে উঠেছে, তেমনি সমাজের সেই বিষবিস্বারী ফণাও আজ ভূমিতে লুণ্ঠিত। যুদ্ধ-মন্বন্তর ও দেশবিভাগের

ফলে পূর্বতন সমাজবন্ধন আজ শিথিল হয়ে এসেছে। তাই শরৎ-সাহিত্যের কৌতূহলী পাঠকের কাছে তাঁর সামাজিক সমস্যার পটভূমি বিগতদিনে একটি ইতিবৃত্ত বলে মনে হতে বাধ্য। তা ছাড়া একালের কথাসাহিত্যে নাগরিক সুর প্রকট হয়ে উঠেছে। সহর ও সহরতলীর জীবযাত্রা, ভাড়াটে মধ্যবিত্তের সমস্যা প্রভৃতি একালের কথাসাহিত্যে একটি প্রধানস্থান অধিকার করেছে।

অংশবিশেষ গৃহীত

শরৎসাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

এরপর কাব্যের যুগের পরিসমাপ্তি ঘ'টে উপন্যাসের আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু নারী-চিত্রণ বিষয়ে উপন্যাসও যে পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নাই, তার কারণ এই আদর্শ আমাদের বাস্তব-জীবনের অস্থি-মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। তথাপি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর সমস্যাকে আদর্শ পরিমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র করে সূক্ষ্মভাবে দেখবার প্রয়েজন অনুভূত হলো। মহাকাব্য-পুরাণে নারীর হৃদয়াবেগের যে সমস্যা আভাসে-ইঙ্গিতে অর্দ্ধস্ফুটভাবে ব্যঙ্গিত হয়েছে, উপন্যাসে তাই মূখ্য ভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখান বা অরণ্যমধে নল কর্ত্তৃক দময়ন্তী ত্যাগ মানবিক উচ্ছ্বাসের দৈব্যপ্রভাবে আচ্ছন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত। সমস্ত ব্যাপারটি শেষ পর্য্যন্ত সতীত্বের সাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার উপায়স্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রে এসে সর্বপ্রথম বাস্তবজীবনে নারীত্বের মর্যাদা সাহিত্য অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বিমলা- গিরিজায়া, লবঙ্গলতী প্রভৃতি চরিত্রে নারীর ব্যক্তিত্ব তার ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা ও রসনার ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা অবলম্বনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি পরিচেয়ে অনেকটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের কাহিনী অলৌকিক প্রভাবযুক্ত ও বাস্তবের শোকাবহ পরিণতি-

প্রবণতার স্বীকৃমি-সংবলিত পৌরাণিক কাহিনীর অনুবর্তন। নগেন্দ্রের সূর্যমুখীর পূর্বপ্রণয়। স্মরণ কালিদাসের অজ-বিলাসের স্মৃতি-বিজড়িত —প্রভেদ কেবল আধুনিক জীবনে প্রণয়স্ফুরণের অধিকতর পল্লবিত বিস্তার। ভ্রমরের অভিমান-প্রবণতা ও অপ্রশমিত বিরহবেদনার মধ্যে মৃত্যু, আধুনিক, বাস্তবর্মিতার নিদর্শন; কিন্তু প্রিয়প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার যে অভিমান তার কুঞ্চিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে একটিমাত্র ভৎসনা-বাক্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল ভ্রমরের নিষ্করুণ পত্র ও সপ্তবর্ষব্যাপী বিমুখতার মধ্যে তারই পূর্ণ-পরিণতি। কালিদাস মরীচির আশ্রমে শকুন্তলার কৃচ্ছ্র সাধন-রুক্ষ আকৃতি ও বিষণ্ণ-গম্ভীর নীরবতার মধ্যেই তার বিরহচ্ছদলীলার অন্তর্গূঢ় ইতিহাসটি লিপি বদ্ধ করেছেন। আধুনিক ঔপন্যাসিক পাঠকের কল্পনাশক্তির উপর আস্থা না রেখে পূর্ণতর, অথচ সুনির্বাচিত বিবৃতির দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটির অন্তর্নিহিত করুণ রসটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ পর্যন্ত আমরা যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি সেটা দৃষ্টিভঙ্গির ঠিক পরিবর্তন নয়; সম্প্রসারণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান মৌলিকতা নায়িকা-চরিত্র ব্যতিরেকে যে প্রতি-নায়িকা আছে, তাদের চরিত্র-চিত্রণে। সূর্যমুখী ও ভ্রমর পৌরাণিক আদর্শে অভিভূত; কিন্তু রোহিণী-কুন্দনন্দিনী সম্পূর্ণরূপে আধুনিক জগতের অধিবাসী। এরা হয়ত প্রাচীন সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যে এদের প্রতিচ্ছবি নাই। দুর্দমনীয় বাসনার বসে সমাজ-বিধি উল্লঙ্ঘন প্রবণতার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি আধুনিক যুগেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিণীর-রোহিণীর চিত্রে মর্মানুপ্রবেশের বিশেষ পরিচয় দেন নি। রোহিণীকে পূর্ব হতে পাপপ্রবণারূপে চিত্রিত করে, তার পদস্খলনকে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের ও অনুশোচনার প্রভাব বর্জিত করে দেখিয়েছেন। রোহিণীর নিঃসঙ্কোচ লালসা, ইতর স্থূল-রুচি, প্রমোদ-বিলাসের

বারাঙ্গনা-সুলভ উদ্যোগ-আয়োজন ও সর্বোপরি স্বৈরিণীবৃত্তি তার কাহিনীকে সূক্ষ্ম মনোজ্ঞতার আভাসমাত্র-শূন্য এবং লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও পাঠকের সমবেদনাকে প্রতিহত করেছে। সুতরাং রোহিণীর চিত্র বাইরে থেকে আঁকা—গোবিন্দলালের মত তার পতন-কাহিনী সূক্ষ্ম সমদেণাস্নিগ্ধ আলোচনার বিষয় হয়নি। কুন্দনন্দিনীর প্রথম প্রণয়ো-উন্মেষের চিত্রে প্রণয়ানভিজ্ঞার বিহ্বল-ভাবোচ্ছ্বাস ও মুগ্ধ স্বপ্নাবিষ্টতার সুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তার শিশুসুলভ সরলতার জন্য তার হৃদয়াবেগের তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে তপরিণমেদর্শী, অসংবরণীয় আতিশয্যই প্রবল। এখানে লেখকের সহানুভূতি আছে, কিন্তু প্রতি-নায়িকার হৃদয়-বিশ্লেষণে এই সমবেদনার ধারা উপন্যাসের অরণ্যসঙ্কুল, বন্ধুর পথ অপেক্ষা কাব্যপ্রবণতান কুসুমাস্তীর্ণ সমতলভূমি দিয়েই বেশী প্রবাহিত হয়েছে।

"শৈবলিনী" এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। শৈবলিনী বঙ্কিম-চন্দ্রের একমাত্র চরিত্রসৃষ্টি, যেখানে শরৎচন্দ্রের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। শৈবলিনী চির রহস্যময়ী নারী প্রকৃতির প্রতীক। তার মনের অব-চেতন প্রদেশের নিগূঢ় আকাংখা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের দ্বারাও তার অন্তর রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন সম্বব নয়। তার সমস্ত বিবাহিত জীবনের মধ্যে প্রতাপেব প্রতি ভালবাসা তার নিগূঢ় মর্মমূলে কি সূত্রে বাসা বেঁধেছিল তার সম্বন্ধে সে বোধহয় পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল না। ফষ্টরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগের দুঃ-সাহসিকতাই তার অন্তরে প্রজ্বলিত দাবানলের প্রথম বহির্বিক্ষিপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। ফষ্টরের কাছে আত্মসমর্পণে প্রতাপ-লাভের সুবিধা কি হবে এই কূটপ্রশ্নের মীমাংসা তার সচেতন চিন্তাশক্তির চেয়ে তার রক্তধারা প্রবাহিত সংস্কারের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। তারপর সুন্দরীর সাহায্যে উদ্ধার-প্রস্তাব প্রত্যাখান প্রতাপের কারামোচনে

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নবাবের দরবারে অসঙ্কোচ মিথ্যা দাবী উত্থাপন—এ সমস্তই তার চারিত্রিক অসাধারণত্ব, তার মনোগহনের অতলস্পর্শ গভীরতার উপর এক ঝলক চোখধাঁধাঁনো সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করেছে।' এই মানস বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতা রেখেই তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন 'মার্লো'র নাটকে অপরিমিত ভোগস্পৃহা চরিতার্থতার জন্য সয়তানের সাহায্যগ্রহণ শেষ দৃশ্যের অসহনীয়, অতিপ্রাকৃত-বিভীষিকা-কণ্টকিত মর্মবেদনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিরূপিত করেছে, তেমনি শৈবলিনীর অন্তরে কামনার অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড তার অনুশোচনা ও আত্মশুদ্ধির মধ্যে জীবন্ত নরকানুভূতির দাহজ্বালা সঞ্চারিত করেছে।' পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দুই এর মধ্যে এমন অনবদ্য ভার-সামঞ্জস্য জগতের অন্য কোন সাহিত্যস্রষ্টা দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

'শরৎসাহিত্যের ভূমিকা' রচনাটি সংগ্রহ করেছেন সুধা নাগ।

শরৎচন্দ্রের সকাশে

হেমেন্দ্র কুমার রায়

সাহিত্যের সংবর্ধনায় আমার হাতসব তখন শেষ হয়েছে বোধ হয়। যমুনার সম্পাদকীয় বিভাগে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করি এবং প্রতিমাসেই গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা কিছু' না কিছু' লিখি।

একদিন বৈকাল বেলা যমুনা অফিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি। এমন সময় একটা লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কো, খুস্কো, চুল এক মুখ দাঁড়ি গোফ, পরণে আধময়লা জামা-কাপড়, পায়ে চটি জুতা। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে সুধলুম" কাকে দরকার ?"

—যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।

—ফণীবাবু এখনো আসেন নি ?

—আচ্ছা তাহলে একটু বসব কি ?

চেহারা দেখে মনে হ'ল লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুকে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, এই যে শরৎবাবু কলকাতায় এলেন কবে ? ঐ বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন ?

আগন্তুক মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন" ওর হুকুমেই ওখানে বসে আছি।'

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সেকি হেমেন্দ্রবাবু। আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেন নি।"

অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে স্বীকার করলুম বললুম, "আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী।"

শরৎচন্দ্র সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হল কথা সাহিত্যের ঐন্দ্রিজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুস পরিচয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্য পরিচয় হয়েছিল এর আগেই। কারণ যমুনার 'কেরানী' গল্প পড়ে তিনি রেঙ্গুন থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। তার একটিবার আমাদের পত্র বিনিময় হয়েছিল।.........

* * *

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ 'যমুনা' অফিসে আসতে লাগলেন। এবং অল্প-দিনের মধ্যেই আমি তার অকপট বন্ধু লাভ করে ধন্য হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল অনেকই। কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অভয় হয়নি। সে সময়ে 'যমুনা' অফিসে প্রতিদিন বৈকালে বেলা একটি বড় সাহিত্য বৈঠক বসত এবং তাতে যোগ দিতেন স্বর্গীয় কবিবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় গল্প লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়। স্বর্গীয় কবি গল্প লেখক সাধনা সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঔপন্যাসিক সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি অমল চন্দ্র সেন। ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার—আরও অনেকের নাম মনে পড়ছে না।

এখানে প্রতিদিন আমদের আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা

আরম্ভ হত ,শরৎচন্দ্র ও মহাউৎসাহে তাতে যোগ দিতেন এবং আলোচনা যখন উত্তপ্ত তর্কবিতর্কে পরিণত সেখানে বরাবরই প্রথম হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

* * *

যমুনা অফিসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিল। ঐ ভেলু কুকুরের অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেতনা। কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না। বরং অনেক মানুষকে চেয়ে ভেলুকে তিনি বড় মনে করেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকার ছিল ভীষণ কুকুরের ভয়। ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে। ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে। আহা! অবোলা জীব। ওর যে দুঃখ হবে। হোটেল থেকে ভেলুর জন্য আসত বড় বড় ঘৃতপক্ক, চপ, ফাউল, কাটলেট। ভেলুর অকাল মৃত্যু কারণ বোধ হয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার। এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রকে শোকাকুল অক্রান্ত হতেই দেখেছিলুম এ জীবনে তা আর ভুলব বলে মনে হয় না।

* * *

একদিন সকালবেলায় মা এসে বললেন, ওরে তোর পড়বার ঘরে কে এক ভদ্রলোক এসে গান গাইছেন—কি মিষ্টি গান!

কৌতুহলী হয়ে নীচে নেমে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি। শরৎচন্দ্র কখন এসে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে গালিচার উপরে ঠেসান দিয়ে শুয়ে নিজের মনে গান ধরেছেন এবং সে গান শুনতে সত্যই চমৎকার।

আমাকে দেখেই তিনি মৌন হলেন কিছুতেই আর গান গাইতে চাইলেন না।

তারপর কয়েকবার আমার নীচের ঘরে তাঁর গানের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছি। আড়াল থেকেও শুনেছি, কিন্তু আমাকে দেখা অমনি তাঁর কণ্ঠ হয়েছে বোবা। আর তাঁর সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না। তাঁর গানে ওস্তাদি না থাকলেও মাধুর্য ছিল যথেষ্ট এবং সঙ্গীত সাধনা করলে তিনি মনে করতেও পারতেন রীতিমত।

* * *

শরৎচন্দ্র শেষদিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, আমার দুই মেয়ে শোকালিক ও মুকুলিকার কাছে বলে গিয়েছিলেন জানা বাছা এসব সিগারেট, ফিগারেট আমার সহ্য হয় না। আমার জন্যে যদি গড়গড়া আনিয়ে রাখতে পারো। তাহলে আবার তোমাদের বাড়ীতে আসব।"

তবে কিছুদিন পরে রঙ্গালয়ে চরিত্রহীন প্রথম অভিনয় রাত্রে আমার মেয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল। কৈ আপনি তো আজ এলেন না ?

শরৎচন্দ্র বললেন, আমাব জন্য গড়গড়া আছে।

—হ্যাঁ।

শুনে তিনি সহাস্যে অস্বীকার করে বললেন, আচ্ছা এই বার যাব।

কিন্তু এখন তাঁর সে অঙ্গীকারের মূল্য নেই। তবু শোকাতুর মনে ভাবছি তাঁর গড়গড়া তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তো আর আর এলেন না ?

হায় স্বর্গ থেকে মর্ত্য কতদূর ?

হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখিত 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' থেকে অংশ বিশেষ গৃহীত।

শরৎ পরিচয়

অনুরূপা দেবী

…হঠাৎ একদিন আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম সেই অপ্রকাশিত লেখক মজফরপুরে আমাদের বাসার অতিথি। আমি সে সময় ভাগলপুরে।"

"আমার স্বামী আমার ঘুমেই শরৎচন্দ্রের লেখার প্রশংসা জনিয়েছিলেম, তাই নাম জানিতেন।

মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান—বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন" একটা বাঙ্গালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়। বেশ গায়, অন্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলে পরিচয় দিলেন, কিন্তু লোকটি বাঙ্গালীই একদিন গান শুনবে ? নিয়ে আসবে তাঁরে ?

*　　　*　　　*

…বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা এক একদিন গান বাজনার আসর বসিত। দিনানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ীতে অতিথি রূপে এখানেই ছিলেন। না করিলেও কিজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু এখন তাঁহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতই ছিল। সে সময় তিনি নূতন রচনা তাহার যে ফুটোনমুখ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে অপেক্ষা

করিতেছিল তাহা তাঁহার ব্যবহারকেও অনেকখানি সৌজন্যমণ্ডিত এবং আকর্ষণীয় করিয়া রাখিত। শ্রীযুক্ত শিখরবাবু এবং বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত সহযোগিতার মধ্যে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন।

শরৎবাবু মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার পরিচয় এখানকার লেখক শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত কোনও অবগত নন। অসহায় রোগীর পরিচর্য, মৃতের সৎকার, এমন কি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখরবাবু বাড়ী থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান।

এই মহাদেব সাহুই শ্রীকান্তের কুমার সাহেব সন্দেহ নাই। মজঃফরপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও শরৎচন্দ্র শিখর বাবুকে বার কয়েক পত্র দিয়েছিলেন। তাহার পর আর বহুদিন তাঁহার সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট—প্রমুখাৎ মুখে শুনি তিনি বর্মা চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে সেখানে তাঁহার মৃত্যু সংবাদও হইয়াছিল।

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' থেকে সংকলিত।

শরৎচন্দ্র

প্রমথ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালী সমাজ শোকাচ্ছন্ন হয়েছেন—তার প্রমাণ দেশব্যাপী এই অসংখ্য শোক-সভা। এই থেকে এই জানা যায় যে, শরৎ-সাহিত্য অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল। পাঠক-সমাজের এই সম্বন্ধে মতামত আজকের দিনে কারও অবিদিত নেই। এখন অনেকে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকদেরও মত জানতে চান। এর কারণ, সকল সময়ে সকল রকমে লেখকদের মতামত যে লোকমতের পদানুসরণ করে না, তার প্রমাণ বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং ওরূপ কৌতূহল হওয়া লোকসমাজের পক্ষে স্বাভাবিক।

লেখক যদি পাঠকের ধরা-বাঁধা মতামতের পুনরাবৃত্তি করেন, তা হ'লে তিনি সহজেই পাঠকের কাছে বাহবা পেতে পারেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ত সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। তিনি প্রথম থেকেই লোক-সমাজের চিরাগত মতামতকে আঘাত করেছেন, তার ফলে প্রথমেই অনেকেই তাঁর বর্ণিত স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রের বিরুদ্ধ হয়েছিলেন।

এই বিরোধী মনোভাবকে উপেক্ষা ক'রে তিনি সমভাবে তাঁর কথা বলে গিয়েছেন এবং সে বিরোধী মনোভাবকে অনুকূল মনোভাবে পরিণত করেছেন। এইটাই তাঁর মহা কৃতিত্ব। তিনি আদর্শ

নর-নারী গড়েন নি—অর্থাৎ দেবদেবী গড়তে বৃথা চেষ্টা করেন নি, গড়েছেন শুধু আমাদের মতন সাধারণ লোক। এযুগে দেবদেবী গড়তে বসলে শুধু পুতুলই গড়া হয়।

আমি যে শরৎচন্দ্রের একজন গুণগ্রাহী, তার পরিচয় আমি বহু কাল পূর্বে দিয়েছি। প্রায় বিশ-বাইশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত আমার 'আহুতি' নামক গল্প-সংগ্রহ আমি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করি। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে নয়,—সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের খাতিরে। আর আজও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আমি সমান উৎসুক।

প্রমথ চৌধুরীর রচনাটি কথাশিল্পী রনজিত কুমার সেনের সৌজন্যে।

বড়দিদি প্রসঙ্গে

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'—বড়দিদি' সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। 'বড়দিদি' যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্য্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' চলছিল তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'ভারতীতে' বড়দিদির প্রথম কিস্তি দাবী করে 'বঙ্গদর্শনের' কার্য্যাধ্যক্ষ শৈলেশ মজুমদার তৎক্ষনাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ 'বঙ্গদর্শনের' দাবী অগ্রাহ্য করে 'ভারতী' তে লেখা দেওয়ার অপরাধ গুরুতর ভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন।

অপরাধ মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তা হয়েছে, কখনো হয়ত ওরা কবিতা টবিতা সংগ্রহ করে রেখে থাকবে, প্রকাশ করবে।"

শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'কবিতা টবিতা কি বলছেন মশায় উপন্যাস।"

কথা শুনে তো রবীন্দ্রনাথ অবাক—

'উপন্যাস কি বলছ শৈলেশ! উপন্যাস লিখলাম কখন আর ভারতীতে তা প্রকাশিত হ'লই বা কেমন করে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু' ভুল করছ?'

পকেটের মধ্যে প্রমান বর্তমান্ তবুও বলবেন, ভুল কর ?' বিরক্তি গম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য প্রকাশিত 'ভারতী' বার করে 'বড়দিদি'র

গল্পটা খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন করে শৈলেশ বাবু বললেন, 'নামে না দিলেই কি আপনি লুকিয়ে রাখতে পারলেন ? এখনো কি অস্বীকার করবেন ?

শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগেই প্রাবল্যে ঔৎসুক বশঃতই রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলেন, তারপর বললেন 'লেখাটি সত্যই চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার বলে স্বীকার করতে উপায় নেই কারণ লেখাটি সত্যই অন্য লোকের······।

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর অবাক স্বরে বললেন, আপনার নয়।

এ অবশ্য প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের আকারে বিস্ময় প্রকাশ করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র থেকে গৃহীত।

স্বদেশ প্রেমিক শরৎচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বসু

"তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিমন্ত্র। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইরেই তিনি বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জিলায় বিতরণ করিয়াছেন।"

"শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না' রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল সেই সুবাতেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।"

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত বাসী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময় যে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাঁহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

"………এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—কলম ধরিয়া রাজনীতি দালে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যের কর্ত্তব্য নহে।" শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—আমি বহুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

"শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ হইল এই যে, দেশমাতা যেমন বিপন্ন তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাসপরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত অবর্ত্তমান হওয়াই সন্তানের কর্ত্তব্য।"

"দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।"

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক, ছিলেন বলিয়া তিনি সভাসমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশ প্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিনটার পরিচয় আজকাল তরুণেরা তেমন জানে—না।"

"তাঁহার মন ছিল সবুজ তরুণগনের আশা আকাংখার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।"

'স্বদেশ প্রেমিক শরৎচন্দ্র' রচনাটি ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত।

শরৎদা

গিরিজা কুমার বসু

.........শরৎদার কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপি শিবপুর থেকে আমার দ্বারা 'ভারতবর্ষ' কার্যালয়ে প্রেরিত হয়েছে এর জন্য গর্ব অনুভব করছি।

আমাকে তিনি সখার মতো দেখতেন, প্রায় সব জায়গায় আমাকে তিনি সঙ্গী করে নিয়ে যেতেন এ গৌরবও আমার মনে চিরদিন সঞ্চিত থাকবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক তাঁর বাড়ীতে শরৎদা প্রায়ই যেতেন। আমাকে নিয়ে যেতেন। সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে সাহিত্যে, স্ত্রীশিক্ষা এই সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুরেনবাবু রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে আমাদের একদিন আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধে শরৎদা কলেজের ছাত্রোৎসবে নেতৃত্ব করেছেন। আমাদের বক্তৃতা করিয়েছেন।

চিঠিপত্র লেখা তাঁর অভ্যাস ছিল না, তাঁর কাছ থেকে পত্রোত্তর না পেয়ে বহু লোক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁকে অহঙ্কারী বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমাকেও একবার যা লিখেছিলেন তা থেকেই তাঁর অন্তরটা বোঝা যাবে—"অবশ্য এ অভিমান করতে পারো যে আপনি তো কই চিঠির জবাব দেন না। এযে জীবনের মস্ত বড়

অপরাধ ও লজ্জা সে আমি জানি। কিন্তু এ মন্দ স্বভাব যাবার দিনে বদলেই বা কি হবে? যা অন্যায় হবার সে তো হয়েই গেছে।"

মানুষকে তিনি কতো ভালবাসতেন যাদের দুর্গতি হয়েছে তাদের সাহায্য করবার মতো কী দরদী প্রাণ ছিল তাঁর।

নিজের শক্তিতে, নিজের গুণে, নিজের অধ্যবসায় তিনি বড়ো হয়েছিলেন। সাহায্য তিনি কারুর কাছ থেকে পাননি বরং বাধাই পেয়েছেন।

কিন্তু বাণীর স্নেহাশীষে তাঁর শক্তিময় লেখনী সব বাধাকে অতিক্রম করে জয়ী হয়েছিল।

হেমেন্দ্র কুমারের কথা অনুসারেই বলি, 'সাহিত্যিক জীবনের মধ্যেই যে তিনি চলে গেলেন। তাঁর পক্ষে ভালোই হোল—নালিশ আমাদের দিক থেকে তাঁর মৃত্যু মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ...।'

তাঁকে যাঁরা জানতেন না, চিনবেন না, তাঁরা বুঝতে পারবেন না আমাদের অন্তরের ব্যথার তীব্রতা। ...."

'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে সুধ: নাগ কর্তৃক সংকলিত।

প্রথম দেখা

কেদার নাথ বন্দোপাধ্যায়

— তাঁর (শরৎচন্দ্র) সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ, কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মুক্তির আশায়—বুঝি কাশীবাস করছেন ?

বললুম, সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অ—লাভ নেই তো। তবে ঝনঝাট থেকে কতকটা মুক্তি মুক্তি পাবার জন্যেই অনেকেরেই আসা। ওই সঙ্গে দেশের লোকেরাও তো কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয় —

—এইটে ঠিক বলেছেন, বলে হাসলেন। বললেন, আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয় ?

বললুম,—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি চরম নাস্তিক।

—কে বললে কোথায় ? ভুল না।

—যা নিয়ে কথা শুনতে পাই সেই 'চরিত্রহীনেই' রয়েছে দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোজনা না দিয়ে বেরিয়ে গিয়োছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধ বেদনা এড়াতে পারেনি। রেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাক্ষাৎ ক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ী ফিরতে পারেন। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক পথ দিতেন, বিশেষ ক্ষতি হত না। আপনি পারেন নি ··

ও কিছু' নয় কেদারবাবু লেখকদের অমন অবান্তারের সাহায্য নিতে হয়, ঐ একটাই তো!

—বহুত আছে। জগতের অবান্তর বহুত আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই দেখেই বলি, আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটা ইনটেকচুয়াল জায়েনট বসিয়েছেন, অনায়াসেই সুরমাকে পণ্ডটিকে হিন্দুর ঘরের একটা সরল বিখ্যাত প্রতিমা গড়েছেন,···· কিরণময়ী স্তব্ধ নিষ্প্রভ হয়েই গিয়েছিল এটা করলেন কেন?

—আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুমনা, তাহলে সাবধান হতুম—

—অনেকেই দেখেন, যার ভাল লাগে তিনিই দেখেন, কোন নাস্তিকের অতি সাবধানী। তাঁরা মাথার সাহায্যে দেখেন বলেই মনে হয়। সুরমার মাধুর্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।

—যান যান বেলা হয়েছে। নমস্কার। দেখতে যেন পাই।

ভ্রাত চলে গেলেন ···।

ভারতবর্ষ—১৩৪৪।

শরৎদা

দিলীপকুমার রায়

আজ মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের কথা।

ইতিপূর্বে আমি লিখেছি এ সম্বন্ধে, তা থেকে উদ্ধৃত করি—। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ এসেছেন এখন চৌধুরীর সাহিত্য সদনে, শরৎচন্দ্রও সেদিন উপস্থিত।

বঙ্গ সাহিত্যের সূর্যচন্দ্র একই আকাশের আসরে যেন—পূর্ণিমার পরের দিন সূর্যোদয়ের লগ্নে।

শরৎদার 'দেনাপাওনার' প্রসঙ্গ উঠল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, :—শরৎ তুমি আমাদের সমজেকে দেখেছো ভিতর থেকে। আমি দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকেই, বলব। আমার যৌবনে ব্রহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজকে খানিকটা একঘরে করে রেখেছিল তো। তাই তোমার তৈরী এ ধরণের চরিত্রকে নিয়েও তুমি স্বার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছো। কেবল মুসকিল এই যে তোমার ভৈরবীকে দেখলে গানের সুরে 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' বলতে ইচ্ছে হলেও মনে হয় পথ্য। নাটকে নভেলেতো বিভিষীকাই জাগবার কথা—অন্তত নাম শুনলে।

শরৎদা হেসে বলেছিলেন : 'ভৈরবী ঝাটা কথাটা মন 'ও' বাবা। বলে ওঠে জানি। কিন্তু আমার ভৈরবী তো কপালকুণ্ডলার কাপালিকদের মতন ভয় দেখায় না।—'ভালোই বাসায়,—"

স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড থেকে)

শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

['শেষের পরিচয়' উপন্যাস শেষ করিবার পূর্বেই শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এই গ্রন্থ শেষ করিয়া উপন্যাসাকারে প্রকাশ করেন। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর রচনা হিসাবে আনা হয়নাই। শরৎচন্দ্রের যে অংশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল শুধু তাহার বৈশিষ্ট্যের বিচার করা হইয়াছে।.......]

মনে পড়ে কোন একপ্রসঙ্গে বার্ণার্ডশ' বলিয়াছেন যে তিনি অবিশ্রান্ত নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন, কারণ কল্পিত পরিস্থিতিতে কল্পিত অথচ জীবন্ত নরনারীকে বসাইয়া তাহাদের মুখে ভাষা দিবার ক্ষমতা তাঁহাব আছে।

বার্ণার্ডশ' সকৌতুকে নাটক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উপন্যাস সম্পর্কেও তাহা প্রযোজ্য।

উপন্যাসই হউক আর নাটকই হউক, তাহার মধ্যে একটি কল্পিত পরিস্থিতিতে কল্পিত নরনারীকে এমনভাবে কথা বলাইতে হইবে বা কাজ করাইতে হইবে যে মনে হইবে তাহারা জীবন্ত। কবি প্রজাপতির মত; তিনি নিত্য নূতন মানুষ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন যাহারা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া, ভাষা ও কার্যের মধ্য দিয়া প্রাণশক্তির প্রমাণ দিতেছে।

শরৎচন্দ্রের এই শক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি নরনারী ও

শিশুকে নানা ঘটনাবিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে প্রাণবন্ত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন। যাহারা শুধু পরিস্থিতির বৈচিত্র্যের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা চিরকালই বলিয়াছেন এই সকল ঘটনা অসম্ভাব্য; ইহারা চমক লাগাইতে পারে, কিন্তু ইহারা সত্য নহে। বাইউলী পাঠশালার সাথীর উদ্দেশ্যে প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, মেসের ঝি শুচিতার আদর্শ হইবে, রুগ্ন বন্ধুকে ফেলিয়া তাহার পত্নীকে লইয়া বন্ধু পলায়ন করিবে—এই সকল পরিস্থিতি একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারকে বিচ্ছিন্নভাবে চলিবে না। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, সুরেশ ও অচলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই সকল অসম্ভব ঘটনাকে বিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছে।

এই সকল চরিত্রের অনন্যসাধারণত্ব অদ্ভুত ঘটনার সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হইতে পারিত না। 'শেষের পরিচয়' গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে অতিনাটকীয় বলিয়া মনে হইতে পারে।

কুলত্যাগিনী রমণী তের বৎসর পরে তাহার পরিত্যক্ত সন্তানের বাধা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পূর্বেকার আশ্রিত যুবকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে এবং সেইখানে স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

যে স্বামীকে তের বৎসরের মধ্যে সে দেখে নাই। সেই মেয়ের অসুখের উপলক্ষ্য করিয়া হঠাৎ সে সেই পুরুষের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল যাহাকে আশ্রয় করিয়া তের বৎসর পূর্বে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘ তের বৎসর সে যাহাকে সঙ্গ দান করিয়াছে।

এমনি আরও অতিনাটকোচিত ব্যাপার এই কাহিনীতে আছে।

ইহারা অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শরৎচন্দ্র যে রহস্যের সন্ধান করিতেছেন তাহার জন্য অনন্যসাধারণ চরিত্র ও বিস্ময়কর পরিস্থিতির প্রয়োজন হইয়াছে।

সেই রহস্যটি কি? শরৎচন্দ্র নারী-হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নারীকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কিনী বলিয়া অপাংক্তেয় করিয়া দিয়াছে, হৃদয়ের শুচিতায় অনুভূতির গৌরবে তাহারা অনন্যসাধারণ হইতে পারে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে বিধবার প্রণয়ে বাস্তবিক পক্ষে কোন কলঙ্ক নাই; রমা রমেশকে যে ভালবাসিত তাহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু তাহাতে গভীরতা বা পবিত্রতার অভাব ছিল না! শরৎচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছেন যে এই সকল রমণী শুধু যে সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহা নহে; তাহাদিকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিড়ম্বিত রহিয়াছে সমাজের দেওয়া সংস্কার। রাজলক্ষ্মী, রমা প্রভৃতির হৃদয়ে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে গভীর প্রণয় ও দুরতিক্রম্য ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে।

তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই যে কোন শক্তি প্রবলতর অথবা কাহার মর্যাদা বেশী। অচলার চরিত্র বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র আরও একটু সাহসী হইয়াছেন। যেইখানে সংঘর্ষ হইয়াছে অনুভূতি ও বুদ্ধির মধ্যে অথবা অনুভূতির অভ্যন্তরেই। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ রহস্য এই যে কথায় যে সকল গভীরতম অনুভূতি আছে তাহাদের মধ্যে অনেক সময় স্ববিরোধিতা থাকে। এই জন্যই তাহারা দুর্জ্ঞেয় ও অলঙ্ঘ্য।

নিজে যাহাকে ভাল করিয়া বোঝা যায় না তাহাকে অপরের কাছে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় না এবং সেই কারণেই তাহাকে আয়ত্তে আনাও কঠিন।

অচলা মনে করিত যে সে মহিমকে ভালবাসিত এবং সুরেশকে

পরস্ত্রীলুব্ধ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে সুরেশের প্রতি তাহার মন অগ্রসর হইয়াছে।

সুরেশ যে অতিনাটকীয় ও দুঃসাহসিক উপায়ে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল ইহা যেন সেই গুহাস্থিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষারই প্রতীক; তাহার হৃদয়ে এই পরস্পরবিরোধী অনুভূতি কেমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সে তাহা বুঝাইতে পারে নাই। সমস্ত ব্যাপারটিকে সে দৈবের অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন! এই উপন্যাসের নায়িকা সবিতা স্বামীর প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ও ভক্তিমতী ছিল।

কিন্তু সেই স্বামীকেই ত্যাগ করিয়া সে বাহির হইয়া গেল রমণীবাবু নামক এক দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে। পিছনে পড়িয়া রহিল তাহার তিন বৎসরের মেয়ে রেণু, তাহার ধর্মপরায়ণ স্বামী, গৃহদেবতা গোবিন্দজী এবং কুলবধূর মর্যাদা। তের বৎসর রমণীবাবু রক্ষিতারূপেবাস করবার পর সবিতার সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। কাহিনীর সেইখানেই আরম্ভ।

তের বৎসর পরেও দেখি স্বামীর প্রতি সবিতার ভক্তি পূর্বের মতই অচলা, মেয়ের জন্য তাহার স্নেহ অম্লান এবং রমণীবাবুর বিরুদ্ধে তাহার বিতৃষ্ণারসীমা নাই। যদি মনে করা যাইত যে রমণীবাবুর সঙ্গে বসবাসের ফলে তাহার বিরক্তি এই আনিয়াছে তাহা হইলে প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া যাইত। তাহাকে 'ঘরে বাইরে'র মোহনির্মুক্ত বিমলার সঙ্গে তুলনা করা যাইত।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তাহার চরিত্রের রহস্য আরও জটিল ও গভীর। যেদিন সে রমণীবাবুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছে সেইদিনও সে রমণীবাবুকে ভালবাসে নাই। অথচ তের বৎসর সে রমণীবাবুর ঐশ্বর্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রী দেহের যে শুচিতা রক্ষা করিয়াছে সবিতা তাহা করে নাই। হয়তো সে মনে করিয়া থাকিবে যে, যে নারী কুল-ত্যাগ করিয়াছে, স্বামী ও কন্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে তাহার পক্ষে দেহকে অকলঙ্কিত রাখিয়া লাভ কি? কিন্তু প্রশ্ন এই, তবে সবিতা গৃহত্যাগ করিল কেন? গভীর নিশীথে অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া যাওয়ার সময় সে বলিয়াছিল, "তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিও না। আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।" তবে তাহার গৃহত্যাগের কারণ কি রমণীবাবুর প্রতি অনুকম্পা? তাহাকে অত্যাচার হইতে বাঁচাবার ইচ্ছা? কিন্তু যে মানুষকে কোনদিন ভালবাসে নাই তাহার প্রতি এই অনুকম্পা তাহার হইবে কেন? বিশেষতঃ সে নিজে এইরূপ কোন ব্যাখ্যা দিয়া স্বীয় পাপকে হাল্কা করিতে চেষ্টা করে নাই। যদি রমণীবাবুর প্রতি দয়াই তাহাকে প্রণোদিত করিয়া থাকিত তাহা হইলে কোন সময়ে সে তাহার উল্লেখ করিত।

তারপর একান্ত অনুগত রাখাল বাহিরের চক্রান্তের উপর যতই জোর দিক না কেন ব্রজবাবুর গৃহে থাকিতে রমণীবাবুর সঙ্গে সবিতার সম্বন্ধ যে শুচিতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যে অবস্থায় নির্জন গৃহে গভীর নিশীথে তাহাদিগকে পাওয়া যায় তাহার ব্যঞ্জনাই যথেষ্ট। সবিতা নিজে তাহার পদস্খলনকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইয়াছে।

স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বেকার আচরণকে সে কখনও অনিন্দনীয় বলিয়া মনে করে নাই। অথচ স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির অভাবও তাহার কোনদিনই হয় নাই। তবে তাহার পদস্খলন হইয়াছিল? নারী-হৃদয়ের রহস্যের ঠিক এই দিকটা শরৎচন্দ্র অন্য কোন উপন্যাসে উদঘাটিত করিতে চেষ্টা করেন নাই।

অথচ পূর্ববর্তী উপন্যাসে তিনি যে সকল সমস্যার সংযোগ আছে। তিনি বহু পদস্খলিতা রমণীকে তাঁহার উপন্যাসের কেন্দ্র করিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু এখানে তিনি তাহাদের জীবনের মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন—ইহাদের পদস্খলন হয় কেন এবং সেই পদস্খলন ইহাদের জীবনের বা চরিত্রের উপর রেখাপাত করে কি না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই উপন্যাস সত্য সত্যই শরৎচন্দ্রের শেষ পরিচয় দেয়।

যে সুগভীর কলঙ্কের বোঝা লইয়া সবিতা সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল্ তাহার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পায় নাই। সে জোর করিয়া বলিয়াছে যে রমণীবাবুকে সে কোনদিনই ভালবাসে নাই, কোন দিন শ্রদ্ধা করে নাই, নিজের স্বামী অপেক্ষা কোনদিন বড় মনে করে নাই, যেদিন গৃহত্যাগ করিয়াছিল সেই-দিনও নহে। সে নিজেকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু উত্তর পায় নাই। তাহার স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে, কিন্তু স্বামীর প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারে নাই। সে বলিয়াছে যেদিন নিজে সে উত্তর পাইবে সেই দিন স্বামীকে তাহার উত্তর জানাইবে।

অথচ রমণীবাবুকে সে ত্যাগ করিয়াছে জীর্ণ বস্ত্রের মত, কি তদপেক্ষা কোন হেয় বস্তুর মত। তাহাদের যৌন জীবনযাত্রার যে চিত্র পাই তাহাতে মনে হয় কোনদিন ইহাদের মধ্যে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

রমণীবাবু প্রতিদিন আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আঁবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিয়াছে,—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত

লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধিরতা—এই কামার্ত অতিপৌঢ় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্বতাকার ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া প্রতি রাত্রে সে তাহার শয্যা-সঙ্গিনী হইয়াছে।

তবু এই ভাবে তাহার একযুগ কাটিয়া গিয়াছে। এক যুগ কাটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহারই সংস্পর্শে আসিয়া তাহার পদস্খলন হইয়াছিল কেন? এই 'কেন'র সে কোন জবাব খুঁজিয়া পায় নাই বার বৎসরের অধিককাল ধরিয়া সে ইহার আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু উত্তর পায় নাই; সারদার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছে, "পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়"। নিজের হৃদয়ের অলিতে গলিতে সঞ্চারণ করিয়া এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সবিতা এই রহস্যের সন্ধান পায় নাই। ইহা তাহার স্রষ্টারও শেষ উত্তর কিনা বলিতে পারি না। হয়ত শরৎচন্দ্র মনে করিয়া থাকিবেন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে যৌন আকর্ষণ তাহার সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতির সম্পর্ক কম, ইহাকে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা অসম্ভব। ইহার মধ্যে কোন 'কেন' নাই।

ঔপন্যাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই করুন আর প্রশ্নের উত্তরই দিন তাঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নরনারীর সম্পর্কের জীবন্ত ছবি আঁকিবেন; তাঁহার চিত্রের মধ্য দিয়া হৃদয়ের রহস্য প্রতিবিম্বিত হইবে, তাঁহার জিজ্ঞাসা সমাধানের সঙ্কেত দিবে।

সবিতার চরিত্র যদি সম্পূর্ণ হইতে পারিত তাহা হইলে হয়ত অসতর্ক কথার মধ্য দিয়া অথবা তাহার ব্যবহারের দ্বারা এই রহস্য সুস্পষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ চিত্র আমরা পাই না। যে উপন্যাস ঔপন্যাসিক শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্ভব নহে। তবু একটা কথা মনে হয়। গ্রন্থের মূল বিষয় হইল পদস্খলিতা নারীর চরিত্র অঙ্কন। অথচ

উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে পদস্খলনের তের বৎসর পরে এবং কাহিনী অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রতিনায়ক রমণীবাবুর অন্তর্ধান হইয়াছে। কাহিনীতে দুইটি ব্যাপার প্রাধান্য পাইয়াছে—সবিতা তাহার স্বামীর কাছে আশ্রয় চাহিয়াছে আর বিমলবাবু সবিতার নিকট আসিতে চাহিয়াছেন।' সবিতার স্বামী ও মেয়ে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে তাহাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। বিমলবাবু বন্ধুত্ব দাবী করিয়াছেন ও পাইয়াছেন; কিন্তু নরনারীর সম্পর্ক যেখানে গভীর, নিবিড় ও রহস্যাচ্ছন্ন এই বন্ধুত্ব সেইখানে পৌঁছায় নাই। সুতরাং কি ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র সবিতার চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে তিনি পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দিতে পারিতেন কিনা তাহা বলা যায় না।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সবিতার চরিত্রে তিনি একটি পরমাশ্চর্য রমণীর চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার মধ্য দিয়া নারীহৃদয়ের গোপনতম ও গভীরতম রহস্যের প্রতি আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। অসম্পূর্ণ হইলেও এই উপন্যাস তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তার পরিচয় দেয়।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত—'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

শিবানী

সতীকুমার নাগ

অশোক দা !

তোমার চিঠি পেলুম। তুমি জানতে চেয়েছো, শরৎ-বাবুর 'শেষ প্রশ্ন' পড়েছি কি না? তোমাকে আমার মতামত জানাতে বলছো আমি জানি, কোনদিনই তোমার সঙ্গে আমার মত মিলবে না। আচ্ছা—তুমি তো এর আগে অনেকবার 'শেষ প্রশ্ন' পড়েছো, এবং এ নিয়ে অনেক তর্কও করেছ বন্ধুদের সঙ্গে—নয়?

সত্যি কথা বলতে কী, কমলকে আমার ভাল লেগেছে। কমল নারী—তাই সে নারীর ব্যথা জানে। নারীর অন্তরে নিভৃত মঞ্চে যে গোপন বেদনা—তা ব্যথায় রঙীন হয়ে উঠেছিল কমলের একদিন। তার প্রতি কথায়, ভাবে, ভঙ্গিমায় উঠেছে মুখর হয়ে।

কমল যেন ছোট্ট একটী ঝরনা। নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে—কতদূর কে জানে? করবী ফুলের অবগুণ্ঠন মোচন করে কমল চায় ফুটতে নিজের মাঝে, নিজেকে ধন্য করতে।

আচ্ছা—তুমিই বল, মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা কোথায়! তার জীবনকে পৃথিবীর সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে উপভোগ করাটা কি অন্যায়?

যে ফুলের কুঁড়ি, পাপড়ী পাতার বন্ধনে ঘুমিয়ে থাকতেই ঝড়ের ঝাপটায় ঝরে পড়ে নীরবে বনভূমির উপর—তাকে আমরা কেউ দেখি না;—দেখার প্রয়োজনও পড়ে না। আমি বলি, নারীর জীবন যদি তেমনি করে নিরর্থক থেকে যায়—সেটা কত বড় একটা অভিশাপ।

যে দিন কমলের বিয়ে হল—তাদের ভালবাসার অনুষ্ঠান গড়ে উঠতে না উঠতে বিদায় নিল তার স্বামী।

কমল দেখল, সে চলে গেছে, তার মৃত্যু হয়েছে, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে তার নিজেরই সব কিছু।

হয়ত একদিন ঘুম হতে জেগে কমল দেখল নিজেকে—তাতে পেয়েছিল মিথ্যার আবরণ, যা নিয়ে কমল দেখল নিজেকে—তাতে মানুষ চলতে পারে না কোন দিন। জানো ত, কমল শিবনাথকে ভালোবেসেছিল।

কমল তার ভালবাসার সব কিছু দিল শিবনাথের পায়ে ঢেলে, আর শিবনাথও তেমনি করে তাকে বরণ করে নিল। এ নিয়ে অনেক, তর্ক কমলের হতো আশুবাবুর সঙ্গে।

আশুবাবু বলতেন—পুরোনকে ফেলে আমরা নূতনকে ধরতে পারি না। তাই আশুবাবু স্ত্রীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে রইলেন। স্মৃতির পূজো দিয়ে স্ত্রীকে রাখলেন মনোমন্দিরে, তাকে মরতে দিলেন না।

কমল একদিন উত্তর দিল—কাকাবাবু, মিথ্যার পরদা টেনে মনের ক্ষুধা চেপে রেখে চলা যে কত কঠিন! স্মৃতি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।—কমল বলতে চায়, তার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে তার কিছুই যায় নি। সে গিয়েছে তার নিজেরটুকু নিয়ে। কমলের কিছুই নিতে পারে নি—তাই কমল নিজের মাঝে রইল বেঁচে। অপূর্ণতার মাঝখানে করতে চাইল পূর্ণ।

অশোক দা! তোমার হয়ত মনে আছে, কমল আর শিবনাথ গিয়েছিল তাজমহল দেখতে।

শাজাহান কি ঐ তাজমহল গড়ে মমতাজকে ভুলতে পেরেছিলেন? সেদিন ঐ তাজমহল তার দুঃখকেই বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ মিথ্যে সান্তনার কি মূল্য আছে?

শিবনাথ একদিন বলেছিল কমলকে—কমল আজ থেকে তোমায় ডাকব, 'শিবানী'—কেমন ?'

কমল মরে হল শিবানী। দিনের পর দিন তাদের ভালোবাসা উঠল গড়ে।

তারপর—বন্যায় জোয়ারের মতই এল প্লাবন। শিবনাথ চলে গেল—শিবানী কাঁদল। শিবানী কত দুঃখী! অজিত এল তাকে দেখতে। শিবানীর ব্যথাতুর মুখে ফুটে উঠল হাসি। অন্তরের ক্ষত বিক্ষত বেদনায় নারী তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে নিজেকে ধরা দেয় না কিন্তু সে হাসি যে কত দুঃখের সেই তা জানে।—শিবানী একটা আসন পেতে দিল অজিতকে বসতে। আর খাবার এনে দিল সমুখে তার। অজিতকে বলল—যার জন্য বুনেছিলুম আসন তাকে ত কাছে পেলুম না। তোমাকে পেয়েছি হাতে, সেই আসনেই বসাই—বসো।

অজিতের কাছে ধরা পড়ল, কমল এখনও ভুলে যায় নি শিবনাথকে। থাক ওসব কথা।

তোমরা বলবে—কমল সমাজের নিয়ম নিষ্ঠা কিছু মানতে পারে নি। কমল বিদ্রোহী, সমাজদ্রোহী তোমাদের চোখে। জানি, তোমাদের নিয়ম নিষ্ঠাগুলি মানুষকে পঙ্গু করে তুলে।

যেটা সত্যি—তা কোন দিনই মানবে না। জীবনের বড় আদর্শ নিজেকে পূর্ণ করা। মৃত স্বামীর স্মৃতির আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকা কি কমলের উচিত ছিল ? সেটা নিজেই বিচার করে দেখো।

তোমাদের দরবারে কোনটা বড়, আর কোনটা ছোট সে তোমরাই জান। নারীর ব্যথা নারীই জানে।

আমার চিঠি পড়ে আমায় ভুল বুঝ না কিন্তু। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা তোমাদের অভাব অভিযোগ জানতে পার আর আমরা তা পারি না। নারীর অন্তরের ব্যাথা অন্তরেই মিলিয়ে যায় —

আজ এখানেই শেষ করছি। ইতি, —মৃদুলা।

শরৎ চন্দ্রিকা

বিমল মিত্র

কথাশিল্পীকে সাহিত্যিকদের স্মৃতি সে তো এক আশ্চর্য মণিকাঞ্চন যোগাযোগ। আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল তাঁদের কয়েকজনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লিখন পদ্ধতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন: "শরৎ হাসিয়া বলিলেন তুমি নাকি পিছন দিক দিয়ে চরিত্রহীন লিখেছ?

—তুমি কি বললে?

বললুম, তাই কি হয়? তবে শেষের দু'চার কপিটার হয়ত আগেই লিখে ফেলেছিলুম। তিনি তো সেই কথা শুনে অবাক, বললেন বল কি শরৎ?

—বললাম, ঠিক করে বলোতো ব্যাপার কি?

—চরিত্র অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করে ওলট পালট খুবই করা চলে। তা ছাড়া এই লেখার বিষয়ে আমার মেমারি বড় স্ট্রং....। নিজের লেখা সম্বন্ধে আমি খাতার পর খাতা ভেবে রাখতে পারি; সেগুলো লেখার সময় আসতে থাকে, হারিয়ে যায় না।"

১৩৫৬ সালের 'মাসিক পত্রে' হীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রর রসালাপ' নিয়ে একটি আলোচনা করেছিলেন, তিনি বলেন: বৈঠক

খানার ইজি চেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছিলেন, গিয়ে প্রনাম করতেই বললেন—এসো। কাল রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলুম।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলুম, কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিষয় শোনবার জন্যে। শরৎ বাবু চাকরের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন এবং চাকর আসতে বললেন—যা হীরেনের চা করতে বল্। আমার জন্যেও একটুখানি করতে বলবি।

চাকর বলে যেতে সকৌতুকে বললেন, বাড়ীতে এক কাপের বেশী চা খেতে চাইলে দেয় না। তোমরা এলে এমনি করে চা আদায় কবি বলে তিনি সম্পূর্ণ অন্য গল্প জুড় দিলেন।...

শরৎবাবুর একটা জিনিস প্রায়ই চোখ পড়ত কোন একটা অতি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর অবতারণা করে শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়ে তিনি সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করতেন, চলে যেতেন অন্য প্রসঙ্গে। অমিও নাছোড়বান্দা অবশেষে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এসে বললেন, যে কবি চন্দন নগরের গঙ্গার ওপর বোটে আছেন। হরেন ঘোষ কাল তাঁকে এসে নিয়ে যায় কবির কাছে।

শরৎবাবু বললেন—কবির কাছে ঘণ্টা দুই ছিলাম। কবি ঠিক আধ ঘণ্টা অন্তর চা, খাবার এটা ওটার ছুতো করে তাঁর সামনে থেকে আমাকে সরিয়ে অনিল চন্দ্রের ঘরে চালান দিচ্ছিলেন। কবি তো শুনেছেন আমার কিরকম শট্‌কা চলে।

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ধূমপায়ী ছিলেন এবং ঘন ঘন ধূমপান করতেন। রবীন্দ্রনাথ এ কথা জানতেন।

"শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবসতঃ তাঁর সামনে ধূমপান করতেন না। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ধূমপানের সুযোগের জন্যই আধ ঘণ্টা অন্তর চা খাবার এটা ওটার ছুতো করে তাঁর সেক্রেটারীর ঘরে শরৎচন্দ্রকে চালান করে দিয়েছিলেন।"

কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যতম একজন অনুরক্ত বললেন, শরৎদা, কবির অভিযোগগুলি দেখেছেন তো? মনে হয় কবি আপনাকে এড়িয়ে ঐ সব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে শরৎচন্দ্রের পরিহাস নামক একটি আলোচনায় লেখেন :—

"... রবীন্দ্রনাথ আমার কী গতি করবেন শুনি? 'আমি তাঁর যা গতি করে দিয়েছি। তার তুলনায় ও কিছু নয়।

শরৎচন্দ্রের এই কথার উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন।

একজন বললেন, শরৎদা আপনি গুরুদেবের খতি করেছেন?

—হ্যাঁ করেছিতো।

—কী খতি করেছেন শুনি?

—সে আর শুনে তোমরা কি করবে?

তবু শুনিইনা।

সকলের শুনবার জন্য পীড়াপিড়ি করতে লাগলেন।...

তখন শরৎচন্দ্র লিখেন, খতি কি করেছি শুনবে? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজা বোসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—তাতে আর রবীন্দ্রনাথের খতি হবে কেন?

—হবেনা? তোমরা কি তার বুঝবে? যাঁর খতি করে দিয়েছি, তিনিই টের পাবেন।

এরপর শরৎচন্দ্রে আরও গম্ভীর হয়ে বললেন,—জানো তো গিরজা কি রকম গল্পের লোক। তার ওপরে কবিতা লেখার ব্যারাম আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এমন কি দু'বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে। আর রবীন্দ্রনাথের স্বভাব'ত, জানই নিজের শত অসুবিধা হলেও, কারও মুখের উপর একটি কথা বলে তাকে বিদায় করতে পারেন না। তাঁর গিরিজা এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে

যেতে থাকবে, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইন লিখতে হবে না।

শরৎচন্দ্র হাত নেড়ে এমন ভাবে— 'আর একটি লাইন লিখতে হবে না—বললেন যে, উপস্থিত সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।"

শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া সভা আর বৈঠকের গল্প কেনা জানে?

আমি দুটি গল্প বলছি। গল্পটি আমার শোনা শ্রদ্ধেয় মানলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

একবার শরৎচন্দ্রকে কোনও এক সভায় সভাপতি করবার জন্য একদল কলেজের ছেলেরা এলো। শরৎচন্দ্রকে নিয়েও গেলো।

সেই সভায় শরৎচন্দ্রকে গান শোনাবার জন্য কয়েক জন গাইয়েকে ডাকা হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে একজন উচ্চাঙ্গে সঙ্গীতের গায়ক ছিলেন। সুরুতেই তাঁর গান ছিল। গান আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে শরৎ পরিহাস করে বললে: 'দাঁড়াও বাপু গাইতে জানে কিন্তু থামতে জানেতো?"

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র বললন, আমার আবার সে সময় নেই। তাই গানটা পরে কর। বলেই শরৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন:—বাড়ীতে গিন্নিজা বস্থ বসে আছে—ও, আমাকে নিয়ে কি করবে তাই বা কে জানে?...

আর একবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর কয়েক জন অনুরক্ত এক জুতোর দোকানে গেলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, চলো চীনে পাড়ায়। ওদের জুতো ভালো, টেকেও বেশ।

শুনে একজন বললেন, কী বলেন দাদা? এই ঠনঠনে ছেড়ে... অগত্যা শরৎচন্দ্রকে আসতে হলো। একটা পছন্দ মত জুতো ঠিক করার পর দাম জিজ্ঞেস করা হল। দামটা যা বললে দোকানী, তারপর সেই দামের অনেক কম বললে।

শরৎচন্দ্র বললেন, না। এখানে কেনা চলবেনা ?

—কেন দাদা পছন্দ হয়নি ?

—পছন্দ হয়েছে। কিন্তু দামটা যা বলেছিল সেটা আবার কমল কেন ? লেখা তো আছে 'এক দর।' বলছে কম ;

অগত্যা চীনে পাড়ার দোকানে এসে অনেক দরাদরি করেও এক পয়সাও কমানো গেল না যা দাম, তাই দিতে হল।

শরৎচন্দ্র দোকান থেকে বেরাবার পর বললেন, দেখলে তো ? ওদের আমাদের মধ্যে কত তফাৎ ওরা যা বলে তাই করে আর আমাদের···

এই বলে শরৎচন্দ্র প্রাণভরে হাসতে লাগলেন।

সুধা নাগ কর্তৃক সংকলিত।

শরৎচন্দ্রের কথা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের' লেখক হেমেন্দ্র কুমার রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেম।

শরৎচন্দ্র যে হেমেন্দ্র কুমার রায়কে কি ভীষণ ভালোবাসতেন তাঁর ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন :—

"......প্রায় বৎসরাধি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত নেই। তখন আমি নতুন বাড়ীতে এসেছি, শরৎচন্দ্র এ' বাড়ীর ঠিকানা পর্যন্ত জানেন না। একদিন দুপুরে তিনতলার বারন্দার কোনে বসে রান্না কার্য্যে ব্যস্ত আছি, এমন সময় একতলায় পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাক শুনলুম। আমার দুই মেয়ে আগন্তুকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এল, 'ওগো বাছারা, তোমরা আমাকে চেননা, তোমরা যখন জন্মাওনি, তখনি আমি তোমাদের আগের বাড়ীতে আসতুম, তোমাদের বাবা হয়তো চিনতে পারবেন এযে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, আজ কুড়ি বাইশ বছর পরে শরৎচন্দ্র অযাচিত ভাবে আবার আমার বাড়ীতে। বিশ্বাস হ'লনা, তিনি আমার এ'বাড়ী চিনবেন কি করে? কিন্তু তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে দেখলুম সত্যসত্যই শরৎচন্দ্র—তাঁর পিছনে কবি-বন্ধু গিরিজা কুমার বসু। সবিস্ময়ে বললুম, 'শরৎদা, এতকাল পরে বাড়ীতে আপনি?" শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন, হ্যাঁ

হেমেন্দ্র। গিরিজার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছেই এসে হাজির হয়েছি।'—আমি সানন্দে তাঁকে তিনতলার ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, 'এযে আমার পরম সৌভাগ্য দাদা, এযে বিনা মেঘে জল। কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি! এযে হাসির কথা।" তারপর অবিকল সেই পুরাতন কালের অভিজাত্য শরৎচন্দ্রের মতই নানা আলাপ-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আবার বিদায় গ্রহণ করলেন।"

আরেকবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এক মনিহারির দোকানে হেমেন্দ্রকুমার রায় একটা জিনিষ কিনতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের শিশু সুলভার পরিচয় পেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন:—

"একদিন বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এক মনিহারি দোকানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জিনিস কিনতে গিয়েছি। হঠাৎ তিনি বললেন, হেমেন্দ্র তুমি কিছু খাও। আমি বললুম, এই মনিহারির দোকানে আপনি আমার জন্যে কি খাবার আবিষ্কার করলেন।"—

কেন, অনেক ভালো ভালো লজেন্স রয়েছে।

বলেন কি দাদা আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট বটে। কিন্তু আমাকে লজেন্স-লোভী শিশু বলে ভ্রম করছেন কেন?

শরৎচন্দ্র মাথা নেড়ে বললে, 'না হে না, তুমি বড় বেশী সিগারেট খাও। ও বদ অভ্যাস ছাড়ো? হয় তামাক ধর, নয় লজেন্স খাও।" সরনের বিষয়, আজাবধি শরৎচন্দ্রের এ আদেশ পালন করতে ইচ্ছা হয়নি।

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত উপরোক্ত ঘটনার বিবরণে আমার সাহিত্য শিল্পী রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের যে পরিচয় পাই, তা তাঁর সরল সুন্দর মনের পরিচয়।

কত ঘটনা ছড়িয়ে আছে যা আমরা জানি না। তবুও নানা ফুলের সাজি থেকে সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিলাম।

কবি গিরিজাকুমার বসু শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন। শুধু তাই নয় শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে বাস করতেন, শিবপুরে শরৎ—সহচর্যে, লেখার মাধ্যমে কবি গিরিজাকুমার বসু শরৎচন্দ্রের পরিচয় তুলে ধরে. দেন নানা বিচিত্র ঘটনায়।

গিরিজাকুমার বসু লিখছেন : –

"……তিনি চা খেতেন খুব অল্প খাওয়া দাওয়া তাঁর বরাবরই কম ছিল. খাওয়ার দাওয়ার অনিয়ম ছিল তাঁর খুব। ইদানিং তিনি চা খেতেন না বললেই হয়। অনেক রাত্রির পর্যন্ত তিনি জেগে থাকতেন, ভোরবেলা পর্যন্ত এক এক দিন। কারণ দুবেলা নাওয়া খাওয়া সময় ছাড়া আমি রোজই তো তাঁর কাছে থাকতুম, সব জানি। রাত্রিতে আমি খেয়ে দেয়ে তার ওখানে যেতুম এগারটা নাগাদ। তার পর আরম্ভ হতো রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ, রাত তিনটে পর্যস্ত পড়া চলতো। অনেক দিন দেখেছি তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে খোলা বই বুকে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সকালে উঠেই তাঁর কাজ ছিল ভেলিকে নিয়ে খনিকটা ঘুরে আসা বেরুবার পথে আমাকে ডেকে নিতেন, ফিরে গিয়ে তাঁর বাড়ীতেই তিনি চা খাওয়াতেন। তিনি সকলের কি রমম প্রিয় ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ছিলেন, তা তাঁর সঙ্গে বেরুলেই বুঝতে পারতেন। ভারি মজার কথা বলতে পারতেন তিনি আর তা যেন গম্ভীর ভাবেই বলতেন।

একদিন শরৎদা সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে ছিলেন না, বৌদির সঙ্গে কথা বলছি হঠাৎ ফিরে এসে একজনের নাম করে শরৎদা বললেন, ওদের বাড়ীতে যে বড় বিপদ।

আমরা বিস্মিত হয়ে কি বিপদ জিজ্ঞাসা করতে শরৎ দা ব'ললেন

"ওদের মেয়ের বর এসেছে কিন্তু সে এত মোটা যে দরজায় ঢুকছে না, ছোট কমিশনারদের অফিস থেকে তেল, আনতে লোক গেছে," আমরা তো হেসেই খুন।

কবি গিরিজাকুমার বসু তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন :—

"হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত শিবপুর ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নেতৃত্ব করবার জন্যে ধরে নিয়ে যাই। সকলে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কখনো যাবেন না। কিন্তু যাক সে কথা রবীন্দ্রনাথ গেছলেন এবং নেতৃত্বে ও করেছিলেন। সহস্রাধিক লোক পরিবেষ্টিত সেই সভায় শরৎদা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা স্নেহ ও তিরস্কৃত হয়েছিলেন। শরৎদা যে প্রবন্ধ সভায় পড়েছিলেন তার এক জায়গায় ছিল—আমি প্রবীন হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন শরৎ এখানে জলধর বাবু উপস্থিত আছেন, আমি আছি তুমি কিনা বলো তুমি প্রবীন হয়েছো!

শরৎদার এই কথা বলা একটা অভ্যাসের মধ্যে ছিল বরাবরই এটা তাঁর স্বভাব সিদ্ধ কৌতুক প্রবনতার ফলছাড়া আর কিছুই নয়। এই কৌতুক করবার ঝোঁক থেকে তিনি কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীমান জলধর বলে, জলধর দার উল্লেখ করেছিলেন। জেরায় তিনি বলেছিলেন ওটা তাঁর ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে বলেছেন।

গিরিজাকুমার বসু শরৎচন্দ্রের অধ্যায়ণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন :—

"খুব অধ্যায়ণশীল ছিলেন শরৎদা,—বই কিনতেনও তিনি অনেক। হার্বাট স্পেন্সারের গ্রন্থরাজী তাঁর খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রাগঢ় অনুরাগ ছিল আর কাব্যের প্রতি যদিও নিজে ছিলেন তিনি কথা শিল্পী তিলক। রোজ তাঁকে হার্বাট (সেন্সারের বই পড়তে দেখেছি শিবপুরে এক সময়।......"

কথাশিল্পী সাহিত্য রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের অমর গ্রন্থ 'শ্রীকান্ত' এই

শ্রীকান্ত গ্রন্থের ইন্দ্রনাথের চরিত্র প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক মাখনলাল রায় চৌধুরী শরৎচন্দ্র ও ভাগলপুর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন।

"......শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, বাঙালীও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ। সন্ধ্যা হয় হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নেই। হটাৎ......পিঠের উপর একটা প্যান্ত ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল পাঁচ সাত মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারদিকে বুহ্য রচনা করিয়াছে পলাইবার এতটুকু পথ নাই। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইয়া বিদ্যুত গর্জিতে বুহ্য ভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল সেই ইন্দ্রনাথ।" সেই অপরিচিত মানুষটি স্বর্গীয় সাহিত্যক সুরেন্দ্র নাথ মজুমদারে ভ্রাতা রাজেন্দ্র অথবা রাজু। রাজু শরৎচন্দ্রকে তথা শ্রীকান্তকে সিদ্ধি চিবাইতে দিলে, সিগারেট টানিতে চলিল। শরৎচন্দ্র ভয়ে জড়বড় হইয়া গেলেন, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে। শরৎ তিন পা পিছালাইয়া গেল। কিন্তু রাজু স্বচ্ছন্দে—সিগারেট টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া শরৎচন্দ্রের মনের ওপর একটা প্রগাঢ় যারিয়া রিয়া আর এক দিকে চলিয়া গেল। ভাগলপুরে সেই যে সিদ্ধি চিবানো, সিগারেট টানা ছেলেটি যে কি এক মোহন মন্ত্রে বালক শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করিল। তাহা জীবনের শেষ পর্যন্ত জানিতে পারেন নাই। ইহার বহুকাল পরে যখন শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনের অসংলগ্ন ঘটনাবলী জড়াইয়া শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী তথা ছদ্ম আত্মচরিত রচনা করিতেছিলেন তখন লিখিলেন, 'শুধু একটি স্মরণ করিতে পারিতেছিনা-অদ্ভুত ছেলেটি সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।" প্রথম পরিচয়ের দিন রাজুর প্রতি ঘৃণা লইয়া শরৎ বাড়ী ফিরিলেন। বালক সিদ্ধি খায় সিগারেট টানে তাহা শরতের শিশুমনের সংস্কারে আঘাত করিল। শরৎ পূর্ব মনে রাজুর

কার্য্যে অনুমোদন করিতে পারিলেন না। আবার কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্র বলিলেন, হঠাৎ কী অনুপম বাঁশীর সুর কানে আসিল। সেই বাঁশীর সুরে আবার রাজু তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। রাজুর ছন্নছাড়া জীবন শরৎকে চুম্বক টানে টানিতেছিল। ক্রমশঃ পরিচয়ের ভিতর দিয়া শরৎ ও রাজু অতীব অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন।"

এই রাজু প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক মাখনলাল রায় চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে লেখেন :—

'বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য এই যে ভাগলপুরেই 'রাজুই' শরৎকে ছন্নছাড়া জীবনের রহুত স্নেহময় দিব্য দৃষ্টি দান করিতে পারিয়াছিল, তাহা না হইলে তো শরৎচন্দ্র আর পাঁচজনের মত ভালমানুষ হইয়া বিবাহ করিয়া সৃষ্টির সহায়তা করিয়া জীবন যাপন করিতেন। 'শ্রীকান্ত' বাংলা সাহিত্যের মান্তি বৃদ্ধি করিতনা। ভাগলপুরেই রাজুই শরৎচন্দ্রকে সত্যিকারের শরৎ করিয়া দিয়াছে, শরতের প্রাণের সুপ্ত দুরন্তকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পী ও ঘরোয়া বৈধব্যের গল্প নিয়ে নানা জনের নানা ধরণের ঘটনা ছড়িয়ে আছে যা তুলে ধরলে শেষ হয় না।

শ্রীশরৎচন্দ্র কি রকম গল্প করে সময় কাটাতে পারতেন সে প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন : আমার বাটির মধ্যে একটা পুকুর ছিল। তাঁহার বাঁধান ঘাটের উপর দুই রোয়াকে বসিয়া আমাদের মজলিস বসিত।...ঘাটের মজলিসে তিনি আসর জমাইয়া বসিতেন পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত এবং ঘনঘন হুঁকার কলিকা বদলি হইত।'

এত্রসঙ্গে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "প্রত্যহ বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুরব করে কাটিয়েছি। তিনি কেবল গল্প লিখতেন না, গল্প করবার অনন্য সাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সভায় তাঁকে মানাতোনা। কিন্তু গল্পের বৈঠকে তিনি ছিলেন যাদুকর গল্পী।

সভা সমিতি দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র বলতে পারতেন না সত্য, কিন্তু বৈঠকে বা মজলিসি আসরে ছিলেন এক আশ্চর্য বক্তা।

কথাসাহিত্যিক প্রেমঙ্কুর আতর্থী বলেছিলেন :—হয়ত অনেকেই জানেন না যে, শরৎচন্দ্র খুব ভাল গল্প বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট। তাঁর লেখার থেকে গল্প বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর।"

শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ধরন নিয়ে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন :—"গল্প শুনিয়া আমি অভিভুত হইয়াছিলাম, শুধু গল্প নয় গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গীতেও।—শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের—তাহাতে ভাবের সংক্রমণতা আরো আশ্চর্য্য"।

দিলীপকুমার রায় লিখেছেন :—শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে আপ্যারন। এ সময় তিনি ভারি হাস্কামী করতেন। চিঠি পত্রেও। এভঙ্গি হল ফরাসী প্রভৃতিতে—এর নাম 'ব্রেভা'। অশি কৃনা নিপূন ভঙ্গিতে 'রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ ভঙ্গী চেনেনা, তারা স্বতই ওঠে চটে—ভাবে কত কি ভুল কথা। এই জন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব ধারনা নিয়ে ফিরকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালি গালাজ করলে আমার বাজত—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ সুখী হতেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।"

শরৎচন্দ্রের গল্পকথা নিয়ে কত গল্পই না আছে।

নানা ফুলের সাজি থেকে সংগ্রহ করে তার কয়েকটার ঘটানা পাঠকদের উপহার দিলাম।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও চরনিকা পত্রিকা থেকে গৃহীত।

ভোলা যায় না

স্বপন ঘোষচৌধুরী

এখনো হাঁটতে হবে পাক্কা চার মাইল। নদীপার হয়ে দু মাইল সবে এসেছি, একটা অজানা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে এপথ সেপথ ঘুরতে ঘুরতে একে ওকে জিগ্যেস করতে করতে গ্রামের শেষ প্রান্তে মাঠের রাস্তার কাছ বরাবর পেঁছিনো গেল।

ছেলেটা আঙুল ইসারায় দেখিয়া বলে উঠিল,

— হুই গেছেক্ পথ। গরু গাড়ীর দিকে ধরে সিধে।

তপ্ত দুপুর। আকাশে গনগনে সূর্য্য আর সামনে পোড়া মাঠ। এলো মেলো গরম হাওয়া গায়ের চামড়া ঝলসে দিচ্ছে।

গ্রামের সীমানা তখনো শেষ হয়নি, আমার চোখ তাই সাগ্রহে সব কিছু দেখে নিচ্ছিল। বড়ই গরীব গ্রাম। বড় সড়ো ধরনের ধানের মড়াই চোখে দেখলাম না একটাও। ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরের ধারে শুধু বহুদিনের পুরনো একটা পাকা বাড়ী। দেওয়ালে ফাটল, বটগাছের সরু ডাল তার ভেতরে শেকড় স্থাপন করে ফেলেছে বহু আগেই।

বাদ বাকী সব মাটির বাড়ী, ভরদুপুরে কেউ ঘরের বাইরে নেই।

দেখে মনে হয় মুদিখানার দোকান। দরজায় তালা দেওয়া, তেল চিট্‌চিটে দাওয়া। বাইরে কিছু ভাসা ভাসা মসলার গন্ধ।

এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। যে দুটো পকুর নজরে পড়ল, দু'টোরই

অবস্থা সঙ্গীন। আর কতদিন তারা এই অনাবৃষ্টির মরশুমে জল ধরে রাখতে পারবে তা হাতের আঙ্গুলে হিসেব কষে বল দেওয়া যায়।

রাস্তা দেখিয়ে ছেলেটা কখন চলে গেছে। মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ পথ হেঁটেছি, আরও দুভাগ পথ সামনে পড়ে।

এই তপ্ত রোদ আর বৃক্ষবিহীন, ঠিক কেশ বিহীন প্রশস্ত টাকের মত খোলা মাঠ দেখে হাঁটবার শেষ ইচ্ছেটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়।

ঠিক করলাম একটু বসে জিরিয়ে নিই। রোদ না কমলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ভুল হয়ে গেছে ছাতা সঙ্গে না এনে। মাথাটা অন্তত পক্ষে বাঁচতো। ভয় হল এভাবে হাঁটলে সর্দ্দিগর্মির আশঙ্কা থাকতে পারে।

ঘুরে এসে বট গাছতলায় বসি। নিরিবিলি, নির্জ্জন। পাতার সোঁ সোঁ শব্দ আর মাঝে মাঝে খসে পড়া। সামনের সামান্য ভাঙ্গা পার হয়ে বাঁশঝাড়। পাতলা। তার ফাঁক দিয়ে দেখাচ্ছে একটা পুকুর। জল প্রায় নিঃশেষিত। তাল গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে সিঁড়ির মত করা হয়েছে। স্থায়ী ঘাট।

মায়ে ঝিয়ে বোধহয় গল্প হচ্ছিল। কি কথা হচ্ছিল তার একটা শব্দও আমার কানে আসছিল না, মুখ নড়ছে বুঝতে পারছি। ভাসা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। কোন শব্দ না পেলেও আমি বলে দিতে পারি ওরা গল্প করছে, কারণ স্ত্রীলোক দু'জনে পাশাপাশি থাকবে অথচ কথা বলবে না বাংলাদেশে এদৃশ্য কল্পনাই করা যায় না। আমিও তো বাঙ্গালী!

ওটা আবার কে? পুকুর ঘাটে নয়, পাড়ে একটা ছোট্ট খেজুর গাছের আড়ালে মাটির কলসী নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে?

ভঙ্গীটা তার অপরাধীর মত। কি অপরাধে অপরাধিনী ও?

প্রায় দশ মিনিট উত্তীর্ণ, ঘাটের স্ত্রী লোক'দুটি আর ওঠে না। মেয়েটাও খেজুর গাছের গোড়ায় বিরস মুখে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শুনতে পাই চিৎকার'—কইরে জল আনবি নাকি ?

ঘাড়টা আপনা থেকেই ঘুরে গেল। ঢোল কল্মি গছের বেঁড়া শেষে ছোট্ট চালা ঘর। শব্দটা সেখান থেকেই আসছে বসে বসে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, চোখ বাধা পায়। একটু উঠে ভালোকরে দেখি শনের মত সাদা দাড়ি আর চুল বিশিষ্ট এক বৃদ্ধকে, লিক লিকে চেহারা, কালো আলকাতরার মত গায়ের রঙ। অনেক বছর পৃথিবীর সুখ দুঃখ উপভোগ করেছেন, নুয়ে পড়েছেন সামনের দিকে হাঁটুর ওপর তোলা ময়লা বিবর্ণ ছেড়া কাপড়! মুখ দেখে যতদূর ধারনা হয়, বহুদিন পূর্বেই হাসি ত্যাগ করেছেন, আশা ত্যাগ করেছেন। চোখের দৃষ্টিতে কোন স্বপ্ন নেই।

অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। এই সব লোক দেখলে আমার ভীষণ কাছে যেতে ইচ্ছে করে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে।

কে যেন আমাকে টেনে তুলল। আমি পৌঁছে গেলাম চালা ঘরের বেড়ার সামনে। চালে খড় নেই, দেওয়ার ভাঙ্গা। ঘর না গোয়াল ঘর বোঝা মুশকিল।

বৃদ্ধ ফিরে চাইলেন। ঘোলাটে দৃষ্টি। আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন। প্রশ্ন আসবার কিছু আগেই—বল্লাম, যাবো দাদার শশুর বাড়ী। বড় রোদ, একটু দাঁড়িয়ে নিচ্ছি।

কোন জবাব নেই। বৃদ্ধ আরও একটু এগিয়ে আসন। বেড়ার ভাঙ্গা বাঁশের দরজায় হাত দিয়ে মুখটা খুব কাছে এগিয়ে এনে প্রশ্ন করেন,—কি নাম ?

বল্লি'—স্বপন।

—কোথায় যাওয়া হবে ?

—বল্লা

—অ বৃদ্ধা চোখ নামান। পেছন ফিরে উঠনের দিকে যেতে যেতে বলেন,—অনেকটা রাস্তা হাঁটি যেতি হবে।

বললাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ রোদ তো, হাঁটতে ভীষণ কষ্ট তাই একটু অপেক্ষা করা।

কোন জবাব এল না। বেড়ায় হাত দিয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল বৃদ্ধ আবার হাঁক দিলেন —খাতুন্না—!

এল খাতুন্না। বৃদ্ধ ডাকদেবার ও অনেক পরে এল।

ফুট ফুটে বাচ্চা মেয়ে। গামছাটা ছেঁড়া ফ্রক এর ওপর জড়িয়ে নিয়েছে। কলসীটা নামিয়ে রেখে হাঁপাছে তখনো।

আমার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে চোখ মুখের চেহারা পাল্টে গেল।

আমি চোখ ফেরাতে পারিনি। আমার আমার অবাধ্য চোখ দুটো একবার বৃদ্ধ এবং একবার বালিকাকে দেখছিল

বৃদ্ধ চিৎকার করে চলেছেন,—তেষ্টায় লোক মরে যাচ্ছে আর উনি পুকুর ঘাটে গপ্পো সারছিলেন।

বালিকা বলে,—মুকুজ্জেদের বৌরা ছ্যালো, টাকে নামতে দিলে না। সেই বামুন মাজলে তারপর জল নিতে পেলুম।

—থাক খুব হয়েছে।

মনের ভেতরে পাতা উল্টিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে গফুর আর আমিনা এসে কখন জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যেন স্পষ্ট চোখের সামনে তাদের দেখতে পাচ্ছি। ঐ তো সেই গফুর আর ঐ তো সেই আমিনা।

দু'টো চরিত্র আমাদের ঘরের। আমাদের একেবারে কাছের।

যে চরিত্র আর কেউ তুলে ধরতে পারেনি, শরৎচন্দ্রের কলম সেই চরিত্রকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাঁর লেখা বলে দেয়, দেখো তোমায় চোখের সামনের মানুষকেই তুমি দেখতে পাওনা। অথচ এরাই তো তোমার সব। তোমার মন তোমার প্রাণ।

আমিনা এমনি করে অবহেলিতার মত পুকুর ঘাটে জল আনতে যেতো। ঘরে বসে রাগের মাথায় চিৎকার করতো গফুর।

বৃদ্ধও তেমনি চিৎকার করছেন। আমি নিজের কানে শুনেছি।

বটগাছের তলায় বসে যে মেয়েটাকে পুকুর পাড়ে খেজুর গাছের গোড়ায় দাড়াতে দেখেছি; এই সেই মেয়ে। শরৎচন্দ্রের আমিনা।

কোন তফাৎ নেই। গফুর আর আমিনা আজ আমার চোখের সামনে গল্পের পাতা ছেড়ে বাস্তব জগতে।

বাখারির দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বৃদ্ধ উঠনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তখনো। আমার দিকে চেয়ে বললেন,—এইখেনটায় ছায়া আছে।

বললাম,—ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দেবেন?

বৃদ্ধ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না আমার কথা। সন্ধিগ্ধ চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠলেন,—ভেতরে তো অনেক হিঁন্দুর···

শেষ করতে দিই না। বলি,—তেষ্টা পেলে কি আর ঘর খোঁজবার সময় থাকে? আপনি বয়স্ক, আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে পারি কিছু?

খাতুজা সেসবের অপেক্ষা রাখেনি। অপেক্ষা করবার বা বোঝবার বয়স তার হয়নি তখনো। চটা ওঠা কলাইকরা গ্লাসে সামান্য ঘোলা জল এনে আমার সামনে ধরল।

চোঁ চোঁ করে খেয়েনিয়েই গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম। খাতুজার পিঠে চাপড় মেরে বলি,—বাঃ বেশ ঠাণ্ডা। মাটির কলসী তো....

কি জানি কেন বৃদ্ধ সস্নেহে আমার দিকে চোখ ফেলে রেখেছেন। অস্বস্তির বদলে আমি যেন আনন্দ পাচ্ছি।

বৃদ্ধর দিকে চেয়ে বললুম,—যাই।

ঘাড় নাড়লেন।

খাতুজা বেড়া টপকে বাইরে এল। বেলা পড়ে গেছে। মাঠের মধ্যে গরু ফেরা রাখালের দল। ধূলো উড়ছে। মেঘের মত সেই ধূলোর মাঝখানে স্পষ্ট দেখতে পেলুম কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রকে। মুখখানা করুণ।

পিছনে চেয়ে দেখবার যা ছিল দেখে দিয়েছি। চোখ দুটো এই সময় বড় বেশী নোনা হয়ে আসে, ঝাপসা হয়ে ওঠে। হাঁটতে থাকি।

সুধা নাগ কর্তৃক সংকলিত।

৩১শে ভাদ্র জন্ম দিনে

রাধারাণী দেবী

একত্রিশে ভাদ্র। এদেশের আপামর সাধারণের প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। যে লেখকের প্রথম রচনা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেই যেন নিঃশব্দে উচ্চারণ করেছিল, "আমি এলাম, দাঁড়ালাম, জয় করলাম।" চারিদিকে বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ ধরনের মানসিকতা আর বিশেষ গড়নের চরিত্রের আধারে যিনি চিরন্তন মানবহৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতিগুলি স্বচ্ছন্দে জীবনায়িত করে তুলেছিলেন। যার মূল উৎপত্তিস্থল হৃদয়ানুভব—কেবল মস্তিষ্কমাত্র নয়। মস্তিষ্কতার শিল্পের সহকারী মাত্র। প্রভু নয়। আজ মস্তিষ্ক-নির্ভর অতি উজ্জল সাহিত্যের দিনেও তাই শরৎচন্দ্রকে মানুষ ভুলতে পারে নি। পারা কঠিন। কারণ হৃদয়ানুভূতিতে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে শরৎচন্দ্রের কথাই বলি। তাঁর সাহিত্য তো আমাদের ঘরে ঘরেই রয়েছে আদরে হোক আর অনাদরেই হোক। সাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষকেরা, বিদ্বজ্জনেরা আলোচনা করবেন, মূল্যনির্ণয় করবেন। সেই সহৃদয় মানুষটি সংসার থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন,—কিছুকাল আগেও যিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত জীবন্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরিচিত মানুষ এখনও বাংলাদেশে অনেকেই আছেন। কিছু-কাল বাদে আর কেউই থাকবেন না। যেমন, মাইকেল মধুসূদনের বা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ-পরিচিত কেউ নেই। কালপ্রবাহ তার অমোঘ নিয়মে সংসারে আসা মানুষের সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলে। তারই মধ্যে অল্প কিছু কিছু মানুষের কীর্তি তাঁদের নামটিকে মাত্র ধরে রেখে দেয়। তাঁদের ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু চিহ্ন সমকালীনেরা সংগ্রহ করে তুলে রাখেন উত্তরকালীনদের জন্য। এই সংগ্রহ নির্ভেজাল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দীর্ঘকাল অনেক মানুষই আমাকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করছেন। আমি লিখতে পারি নি। না পারার কারণ, আমার ধারণা কারুর সম্পর্কে স্নেহাভিভূত ও শ্রদ্ধাবিভূত থাকলে তাঁর সমন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকার কমে যায়. ঠিক অবাধভাবে বোধ হয় লেখা যায় না। অতিপ্রিয়জন সম্পর্কে কথা বলা শক্ত বৈকি। নিজের অজ্ঞাতেই হয়তো হৃদয়ানুরঞ্জনে রঞ্জিত করে ফেলতে পারি। তাই বক্তা না হয়ে শ্রোতা হয়েই বেঁচে আছি।

*   *   *   *

শরৎচন্দ্র অতি সহজ মানুষ ছিলেন। বাইরে জীবনযাত্রায় আলাপে, আচরণে—এত বেশি সাধারণ যে অনেক সময়ে অনেকে বিখ্যাত লেখক শরৎচন্দ্রকে দেখে, কিছুটা হয়তো হতাশ হয়েই ফিরেছেন সফিস্টিকেশন্ বিরহিত অতি সাদাসিধে গ্রামীন মানুষ। গ্রামের সবুজ স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর হৃদয়ে, আলাপে, আচরণে। কোনও-খানে আরোপিত কিছু ছিল না। কথাবার্তায় ঢিলেঢালা, তাতে সব সময়েই কিছুটা কৌতুকের রং চড়ানো। সে কৌতুক হয়তো কিছুটা গ্রাম্য কিছুটা স্থূলতার পর্যায়েই পড়তো। এ নিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ করলে বা তাঁকে সতর্ক করতে চাইলে তিনি আরও উৎসাহিত

হয়ে বেশি করে নিজেকে স্থূলরসিক প্রমাণ করতে তৎপর হয়ে উঠতেন। তাঁকে যখন বলেছি—আপনার লেখার মধ্যে তো কৈ কোথাও কখনো এমন স্থূলরসিকতা দেখিনি।'

হেসে বলছেন—কলম আর জিভ্ তো এক নয় বাপু। কলমের কি রক্ত মাংস আছে? জিভ্ চড়া ঠাণ্ডায় চড়া গরমে ছাঁৎ করে লাফিয়ে ওঠে, ঝালে জ্বলে ওঠে, মিষ্টিতে অভিভূত হয়; কলম নির্বিকার থাকে। তাই, কলম কেবলমাত্র ভদ্রলোক,—জিভ্ খাঁটিলোক।

বলতেন—কলম দেখে ভেবেচিন্তে হিসেব করে মেপেজুখে। অনেক কিছু লিখে ফেলতে ইচ্ছে হলেও, তার গলাটিপে বন্ধ করে রাখতে হয়। তার বলার জায়গা সীমা বাঁধা উঠোনে। জিভের জন্য তেপান্তরের খোলা মাঠ। যা খুশি বলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলুম কোথাও চিহ্ন রইলো না। কতো সুবিধে বলো দিকি! ঐ জন্যে শাস্ত্রে লিখেছে—'শতং বদ মা লিখ।'

শরৎচন্দ্রের অন্তঃপ্রকৃতি গভীর ছিল। কোনও দুঃখের ক্ষণে বা দুঃখের আলোচনায় তা ধরা যেত। তিনি নিজের সম্বন্ধে বা নিজের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন না! কিন্তু অন্যের মুখে শুনতে খুবই ভালবাসতেন। বালকের মতোই উজ্জ্বল সরল আনন্দে খুশি মুখে নিজের লেখার সপ্রশংস সমালোচনা উৎসাহিত হয়ে শুনতেন। এ উৎসাহ দেখে তাঁকে পরিহাস করে বলেছি—এমনভাবে আশ্চর্য মুখে আনন্দ বিগলিত হয়ে আপনি বাঘা-বাঘা অধ্যাপকদের সামনে আপনার নিজের লেখা সম্বন্ধে ওঁদের প্রশংসা শুনে অভিভূত হচ্ছিলেন, আপনাকে হয়তো খ্যাতিলোভী প্রশংসা-কাঙাল ভাববেন ওঁরা।

উত্তরে উচ্চহেসে বলেছেন—পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের রসদ যদি মূর্খদের লেখা থেকে বার হয়, অবাক্ হবো না? বলো কী তুমি? ভেবে দেখ,—

রবিবাবু স্কুল-পালানো ছেলে তাঁর ভাবনা চিন্তা গল্প-পত্তকে নিয়ে এখন বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা কতো বড়বড় সমুদ্র উঁচু উঁচু পর্বত আবিষ্কার করতে লেগে গেছেন। আমরা তো ওঁদেরই বিস্তার পর্বতের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকাতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়ে ফেলি। ওঁদের মুখে প্রশংসা শুনে আহ্লাদ করব না ?

এই রকমই ছিল তাঁর বাক্যালাপের ভঙ্গী।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোমলতা ছিল মাতৃহৃদয়ের মতো অকৃত্রিম এবং প্রগাঢ়। সত্যিই, এমন মমতা-কোমল মন সংসারে অল্পই দেখা যায়। কিন্তু, তাঁর মধ্যে একটি ঋজু দৃঢ়তাও ছিল। সেখানে তিনি ছিলেন অনমনীয়। দেশকে ভালো-বাসতেন প্রাণ দিয়ে। দেশের জন্য মমতাব্যাকুল অসহায় মায়ের মতই ছট্ ফট্ করতেন তার দুর্দশার প্রতি তাকিয়ে। কুসংস্কার, অশিক্ষা কুশিক্ষা, দারিদ্র, নিরন্নতা এ নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা ও বেদনার সীমা ছিল না। দেশের মানুষদের চিনতেন। তাদের চারিত্রীক দুর্বলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। সেই দুর্বলতার প্রতি তাঁর তীব্র বিরাগ ছিল, কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না, ঘৃণা ছিল না। বরং একটি অসহায় করুণাবোধ ছিল। এটি তাঁর সাহিত্যেও নানা চরিত্রের মধ্যে বার বার ব্যক্ত হয়েছে। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল যেন সহজাত। এ শ্রদ্ধা তাঁর নিজ জীবন থেকেই বাল্য কৈশোর ও যৌবন আহরিত। মেয়েদের দুর্বলতা সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সেখানে তাঁর আঘাত কঠোর অথচ নিঃশব্দ ছিল পুরুষ চরিত্রের দুর্বলতায় যেমন খোলা গলায় গলায় স্পষ্ট প্রতিবাদ তুললেন, মেয়েদের বেলায় সেটি তুললেন ইঙ্গিতে। তাঁর সাহিত্যেও এটি লক্ষ্য করা যায়।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে একটি বেদনাসিক্ত অভিমান ছিল।

এ বেদনা বা এ অভিমান তাঁর একান্তই নিজস্ব ছিল। এখানে

তিনি কখনও কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি, অংশ দিতে চান নি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মানুষের মর্মস্পর্শী করে তুলতে সহায়তা করেছে এই তাঁর ধারণা ছিল। তিনি নিজে জীবনের নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত না হলে, বেদনা পেলে এই গভীর হার্দ্য-সহিত্য আমরা পেতাম না।

শরৎচন্দ্রের জন্ম আমাদের দেশে অক্ষয় হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হতে থাকুক এই প্রার্থানা করি।

পুনর্মুদ্রণ

দিলদার

অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে ১৩৪৪ সালের ১২ই মাঘ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে প্রবোধ দিয়ে একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে।
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে হরি।

শরৎচন্দ্র ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ অমরলোক যাত্রা করেন।

তাঁর শেষ রোগশয্যার কথা তৎকালীন অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত 'বতায়ণ' পত্রিকায় বের হয়েছিল, তাঁদের বিবরণী নীচে আমরা উল্লেখ করলাম :—

"মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে থেকে শরৎচন্দ্রের ব্যাধি প্রকট হয়। চিরদিন তিনি বলতেন, শরীরে আমার কোন ব্যাধি নেই, শুধু অর্শটাই মাঝে মাঝে যা একটু কষ্ট দেয়। অর্শ যে আর সারবে না আমার মনে হয় না, তা এতদিনও আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে যে ওকে আশ্রয়হীন করাও কঠিন। কিন্তু কুমুদ (ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়), ওর পরম শত্রু। সে বলে ওকে তাড়াতেই হবে। এ-কথা ওকে আর জানতে দিই নে। জানলে ভয়ে ও এমনি সঙ্কুচিত হ্যয় উঠবে যে প্রাণ আমার ওষ্টাগত

করে তুলবে। একেই তো ও'কে খুশী রাখতে দিনে কয়েক ঘন্টা আমার কাটে। এরওপর ও যদি অভিমান করে তা হলে' বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা কি হবে।...অর্শ'র কথা উঠলে এমনি পরিহাসই তিনি করতেন।

দিন যায়...অর্শ রোগটি পুরাতন ভৃত্যের মত তাঁর সঙ্গেই থাকে। একদিন ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় নিষ্ঠুরভাবে তাঁর দেহ থেকে কেটে বার করে দিলেন। তিনি বললেন, বাঁচলুম। এতদিনে সত্যিই ও' আমায় ছেড়ে গেল। কিন্তু ভয় হয়, প্রতিশোধ নিতে ও কুমুদকে না ধরে।'

হঠাৎ তাঁর শরীরে প্রতিদিন জ্বর হতে লাগল তার সঙ্গে কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত এক রকম যন্ত্রণার সুত্রপাত হল। জ্বরও ছাড়তে চায় না—যন্ত্রণাও যেতে চায় না। একদিন জ্বর গেল, কিন্তু যন্ত্রণা রয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বললেন, নিউরলজিক পেন।...নানা চিকিৎসা চলতে লাগল—শেষে যন্ত্রটার উপশম হ'ল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে একরকম অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। পরীক্ষায় বোঝা গেল পাকস্থলীতে 'ক্যানসার' হয়েছে। এ কথা তাঁর কাছে গোপন রাখা হ'ল—ইতি মধ্যে রঞ্জন রশ্মির পরীক্ষার সাহায্যে চিকিৎসকেরা রোগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন।

চিকিৎসকেরা বড় মুসকিলে পড়লেন। শেষে স্থির হলো বাড়ী থেকে (২৪ নং অশ্বিনীকুমার দত্ত রোড) তাঁকে কোন নার্সিং হোমে রেখে, শরীরে যখন কিছু শক্তি সঞ্চয় হবে তখন অস্ত্রোপচার করা হবে।

এই সিদ্ধান্তের পরই তাঁকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ তারিখে পার্কষ্ট্রীটের একটা য়ুরোপিয়ান নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হওয়া পর ১লা জানুয়ারী ১৯৩৮ তিনি চলে আসবার জন্য এমনি জিদ করে বসেন যে তাঁকে অন্য নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা ব্যাতীত আর উপায় রহিল না। তিনি বলেছিলেন,

আমাকে যদি এখান থেকে না নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে আমি মাথা ঘুরে মরবো নার্সগুলো আমাকে বড় বিরক্ত করে। (মানে, তাকে তামাক ও আফিম খেতে দেয় না।)

যেখানে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল তার নাম হচ্ছে' পার্ক নার্সিং হোম।' ক্যাপ্তেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরস্থ ৪ নং ভিক্টোরিয়া টেরাসের ভবনের নীচের তলায় এটা অবস্থিত। এরই ১ নং ঘরে তাঁকে রাখা হ'লো।

এখানে বহুদিন থাকবার পর বুধবার ১২ই জানুয়ারী তারিখে বেলা ১২ টার সময় অত্যন্ত গোপনে তাঁর পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করা হয়। এটা ক্যানসারে উপর অস্ত্রোপচার নয়। মুখের মধ্যে দিয়ে কিছু খাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই অস্ত্রোপচার ব্যাপারে যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বেশ বুঝা যায় মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি এতটুকু শঙ্কিত ছিলেন না। চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের কোন আশাই রাখেন নি, তাই তাঁন অস্ত্রোপচারে পক্ষপাতি ছিলেন।

শরৎচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা অস্ত্রোপচার করতেই হবে। জোর করে বললেন, আমি বলছি তোমারা কর, তোমাদের কোন দায়িত্ব নেই....ভয় কিসের।...I am not a woman.

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। এর পর চারদিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬ই জানুয়াবী ২রা মাঘ, রবিবার বেলা দশটার সময় নার্সি হোমেই তাঁর নিজের জীবনলীলার অবসান হয়।......

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কথা ও জীবনলীলা প্রসঙ্গে তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা আমরা কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি:—

"ললিত বাবু বললেন,—বৃথা নার্সি হোমে রেখে টাকা খরচের প্রয়োজন কি? বাড়ী নিয়ে যান।

অস্ত্রের পর ললিতবাবু আর ফি নেননি। ললিতবাবু রাত নটা দুশটার সময় এসে দেখে বললেন—কাল ভোরে ছ'টার সময় অ্যমবুলেন্স নিয়ে এসে আমি বাড়ী পৌঁছে দেবো।

সব ঠিক হল, সন্ধ্যের কিছু আগে আমি বাড়ীতে যাবার সময় শরৎকে বললাম— কাল সকালে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো! একথাটা মনে রেখো, মুখে কিছু খাবে না।

শরৎ বললেন,— দেখো তুমি আমাকে খুব চেন। কারন না বললে আমি কোন আদেশ উপদেশ মানি না, বুঝিয়ে দাও কেন খাব না।

— মুখ দিয়ে খেলে তোমার নিশ্চয়ই বমি হবে। যদি বমি হয় তো পেটের সব বাঁধন কেটে গেলে আর রক্ষা করা যাবে না, এতো সহজ কথা।...

শরৎ আদর করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন— এবার তুমি আমাকে খাইয়ে দিয়ে যাও।

খাওয়ান মানে টিউবে করে —অঙ্গুরের রস খাইয়ে দিয়ে বললুম— যেতে যাচ্ছি। নটা দশটা নাগাদ ফিরব।

শরৎ বললেন — কেন কষ্ট করে আসবে?

—বাঃ সকালে ললিতবাবু এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন, ঠিক হয়ে গেছে। আজ তোমার খাট বিছানা বাইরে ঘরে আনা হয়েছে। এখানে থেকে মিছে খরচপত্র হচ্ছে। তুমি একটু সারলে তোমাকে কুমুদ বাবু ইউরোপে নিয়ে উচিত ব্যবস্থা করে ফিরিয়ে আনবেন।

বাড়ী এলাম।

বড়মাকে বললাম, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আজ। কাল সকালে শরৎকে বাড়ী আনতে হবে।

খেতে বসলে ছোটমা (প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রী) এসে বসে বললেন, তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

—আসবার সময় তাঁকে দেখতে পাইনি। আমি হেঁটে এসেছি। এখুনি খেয়েই ফিরব।

এমন সময় প্রকাশ এসে বললেন, দাদা বলেদিলেন আপনি সকালে যাবেন। আমি গাড়ী ছেড়ে দিলাম।

—বেশ আমি হেঁটেই যাব।

—কি দরকার? প্রকাশ বললেন।

উত্তরে বললাম—শেষ রক্ষা দরকার, হেঁটেই যাব।

হেঁটে যাবার সময় দুই বউ আমার যাওয়ার বাধা দিতে লাগলেন।

বোকা মানুষ তো—তাঁদের তুষ্ট করলাম।

তখন রাত দুটো হবে। ফোন বেজে উঠল।

—কে?

··রয়টার।

ইংরাজীতে প্রশ্ন হল—ডাঃ চ্যাটার্জ্জী কেমন?

—ভালই।

—কোথা থেকে বলছ!

—বাড়ী থেকে।

ফোন স্তব্ধ হল।

বড়মা দৌড়ে এলেন।—কি মামা?

—কিছু না। কাগজওয়লারা জানতে চাচ্ছে।

শুনে মনে হল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। রয়টার জানতে চায় কেন?

নার্সিংহোমে ফোন করতেই জবাব এল—ডাঃ চ্যাটার্জী বমি করছেন।

সর্বনাশ।

উঠে পড়লাম। ছুটে যাচ্ছি, বড়মা বেরিয়ে বললেন, কি হয়েছে মামা?

—আমাকে যেতে হবে।

—চা করে দি।—বলে স্টোভ জ্বালালেন।

চা খেয়ে, তখনও বেশ অন্ধকার। ছুট দিলাম।

পৌছে দেখি শরৎচন্দ্র বমি করছেন এবং মৃত্যুঞ্জয় (মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নামে শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন এক ব্যক্তি) পাশে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

—একি শরৎ।

—আমি মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে.......

চারদিকে অন্ধকার দেখলাম।

ডাঃ সুশীলকে ডাকতে তিনি এলেন।

তিনি ফোন করলেন কুমুদ বাবুকে।

তিনি এলেন।

বমির পরে বমি। অবশেষে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান লোপ হল। আমাদের সকল প্রচেষ্টার শেষ হল।

ললিতবাবু এলেন।

ফিরে গেলেন।

"এই খানেই শরৎচন্দ্রের জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের শেষ।"

শরৎচন্দ্রের অন্তিম কালে তাঁর মৃত্যুশয্যা পাশে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রদেব প্রভৃতি যে কয়জন বন্ধু ছিলেন তারা অপরাজেয় কথাশিল্পীর মৃতদেহ গাড়ীতে করে বালীগঞ্জে (২৪ নং অশ্বিনীদত্তের রোডে) আনা হল।

ঝড়ের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়লো।

অমর কথা শিল্পী নেই এ' সংবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে বললেন :—

"যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির

দ্বারা চিত্রিত করেছেন। আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমি গভীর মর্ম বেদনা অনুভব করছি।"

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শোক সংবাদের কথা লিখতে গিয়ে যা উল্লেখ করেন তা এই :—

"দেখতে দেখতে চারদিক থেকে অগণিত লোক এসে মৃতশরৎ-চন্দ্রের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে লাগলেন। এঁদের অনেকের নিজ নিজ পক্ষ থেকে, আবার অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শবাধারে পুষ্পমাল্য দিয়ে গেলেন।

বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবকে শোভিত শবাধার নিয়ে শোকযাত্রা বেরোয়। এই শোকযাত্রা, পরিচালনা করবার ভার নিয়েছিল, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও শরৎচন্দ্রের জয়ধ্বনি করতে করতে হাজার হাজার নরনারী শবাধারের আগে পিছে চলেছিল। শোকযাত্রা অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহরপুকুর রোড, ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড, ও আশুতোষ মুখার্জি রোড হয়ে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গিয়ে পৌঁছেছিল। এলগিন রোডে, সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ীর সামনে এবং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর সামনে শবাধার থামিয়ে এই দুই বাড়ীর পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যদান করা হয়েছিল।

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ৫-১৫ মিনিটের সময় শরৎচন্দ্রের চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। মুখাগ্নি করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাহিত্যিক শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে অথবা শ্মশানে গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—কলকাতার তৎকালীন মেয়র সনৎকুমার রায় চৌধুরী,

অনারেবল সত্যেন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জে. সি. গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কুমার মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, মিঃ বি. কে. আমেদ, মিঃ মিসেস মুকুলদে, রায়বাহাদুর জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতি।"

বরেণ্য সাহিত্যিক অমর কথাশিল্পীর মহাপ্রয়াণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—'সাহিত্যচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিস্ক খসে পড়ল। যদিও বহুবর্ষ তাঁর নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।'…

বাংলার জনপ্রিয় নেতা শরৎচন্দ্র বসু বলেছিলেন,—'বাঙ্গলার মায়ের নয়নের মণি হারিয়ে গেল। তিনি ছিলেন উদার, কোমল হৃদয় ও আবেগময়, তার হৃদয়ে ছিল সর্বপ্রকার অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা।'

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন,—'বঙ্গ সাহিত্য তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁর পাঠক মহল ছিল অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কংগ্রেস একজন 'প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাল। বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের এবং তাঁর পরিবারবর্গের এই শোকে আমরা সকলেই শোকার্ত।

মাদ্রাজের মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী বলেছিলেন,—"শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গলা দেশের বিরাট ক্ষতি হয়নি। সাহিত্য জগতেরও ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাঙ্গলার তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দী ঔপন্যাসিক।"

মিঃ সি. এফ. এণ্ডরুজ বলেছিলেন,—"শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন মহিমাময় সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলার যে বেদনা ফুটে উঠেছে, আমার সমবেদনা এর সহিত যুক্ত করলাম। সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গলার জন্য দুঃখিত।"

জননায়ক মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন,—"যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবেনা। সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্পকথার মতই বিস্ময়কর।…হিসাবে তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্কে যেই আসিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও চিরদিনের মত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুরে পর সে সময় ভারতবর্ষ, বসুমতী, সাহানা, বিচিত্রা, বাতায়ণ, খেয়ালী, চয়নিকা, প্রভৃতি পত্র পত্রিকা শরৎ স্মৃতি সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। সেই সব পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের সমস্ত খ্যাতনামা লেখকেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় শরৎ স্মৃতি সংখ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে লিখিবার অনুরোধ করেছিলেন প্রখ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে যা বলেছিলেন তার কিছু অংশ উল্লেখ করলাম—

"আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রাপ্তি পাওনা ছিল, নিতান্ত অবিবেচকের মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই অকৃপণ লেখনিতেই সেরে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পরে শরৎই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রছন্ন ছিল। আমার

ভাগ্যে উলটোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচার করেছেন, যদি ঠিক সময়ে মরতে পারতুম তা হলে নিসেন্দেহেই যথোচিত ভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন।...."

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখলেন ;'...আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূরবর্তীদের আর কারো তেমন ঘটেনি। তিনি সমপূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের।....

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌছলেন বাংলা সাহিত্য মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয় উত্তীর্ণ হোতে দেরী হলোনা। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন।...

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে সরে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতার বাস।....এই সময়ে শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোন আশ্রয় করে আপন কর্মের বেষ্টনে গা ঢাকা দিয়েছিলুম সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেশবার কোন সুযোগ হোল না।

কোন কোন মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশী সুগম। শুনেছি শরৎ-সে জগতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আবার দেখা শোনা কথাবার্তা হয়নি, যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখা শোনা নয়, যদি চেনা শোনা হোত, তবে ভাল হোত। সমসাময়িক সুযোগটা সার্থক হতে। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতে বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে গিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির মধ্যে কথা শিল্পীর প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ আর ভালবাসা ফুটে উঠেছে।

অন্তিম মুহূর্তে শরৎচন্দ্রের শেষ কথা: আমাকে দাও—আমাকে দাও।"

এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছিলেন।

…"কে তাঁকে কী দিতে এসেছিল, কিসের জন্য তাঁর এই অন্তিম আগ্রহ?……

শরৎচন্দ্রের মুখ চিরমৌন; শরৎচন্দ্রের লেখনি চির অচল। তাঁর প্রার্থিত সেই অজ্ঞাত নিধির কথা কেউ জানতে পারবে না।"

এই রচনাটি লিখতে গিয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল, গোপালচন্দ্র রায় ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।—দিলদার

নীরবতার অন্তরালে

মাখনলাল রায় চৌধুরী

নীরব প্রেমিকা সমস্যাও শরৎ সাহিত্যে আছে? তাহারা খুব বৃহৎ স্থান ব্যাপিয়া নাই। তাহাদের নিভৃত স্থান হইতে জোর করিয়া না বাহির করিলে তাহারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইত। বড়দিদি, নীলিমা, রমা ঘটনাক্রমে দুর্বল মুহূর্তে অন্তরের অশ্রুতবার্তা অতর্কিতে উচ্চারিত করিল। এমন কি ইহারা কেহই নিজের মনের কাছে নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে পারিত না। রুদ্ধশ্বাসে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বন্ধ করিয়া মনকে তাহারা চোখের আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

কে জানিতে পারিত বড়দিদির নীরব প্রেমের গোপন কথা যদি মাধবীর সম্পত্তি বিক্রীত না হইত, এবং সুরেন্দ্র আকুল হইয়া তাহাকে সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য নদীপথে না ছুটিত? যেমনে গোপনে অস্পষ্ট ভাবে মাধবী ভালবাসিত, তেমনি গোপনে শুকাইয়া যাইত বড়দিদির ভালবাসার ক্ষীণ ধারা।

নীলিমা নিজেও জানিত না যে বৃদ্ধ আশুবাবু সেবার চোর বালিতে তাহা পদদ্বয় দিজের অজ্ঞাতসারে ডুবিয়া যাইতেছিল। প্রিয় কন্যা মনোরমা অজিতকে ত্যাগ করিয়া শিবনাথকে গ্রহণের ব্যথা আশুবাবুর প্রাণে খুবই রাজিয়া ছিল; নীলিমা দিতে আসিল সান্ত্বনার প্রলেপ। বিপত্নীক বৃদ্ধের সেবা পরিণত হইল সহানুভূতি।

মনের অগোচরে সহানুভূতি পরিণত হইল গোপন প্রেমে। আশুবাবুর বিদায় বেলায় যদি নীলিমা আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিত, নিজেকে বিশ্লেষিত, না দেখিত, তবে হয়ত সেই নিভৃত প্রেমের কথা আশুবাবু ও কমল কেহই জানিতে পারিত না। উৎস মুখেই সে স্তব্ধ হইয়া যাইত।

শৈশবে একত্র বর্ধিত রমেশদার প্রতি রমার কিশোরী মন যে কবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা রমেশ সঠিক জানিত না। মনের কোন্ নিভৃত কোণে কখন তপ্ত হইয়াছিল সে প্রেমের অঙ্কুর তাহা রমা কি জানিত? কৃতকর্মের অনুশোচনা ব্যপ্ত দেশে যদি রমা জেঠাইমার নিকট অসতর্ক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ না করিত, তবে কি সেই নিভৃত প্রেমের মর্মন্তুদ কাহিনী কখনো প্রকাশ হইত? রমেশ রমার নিকট নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিল; রমা কিন্তু নীরব। তাহার সমস্ত পূজাই নীরবে। মাঝে মাঝে নিজের অলক্ষ্যে মনের মধ্যে নিজেকে রমেশের সঙ্গে জড়িত করিয়া ফেলিত—তখনি চমকিয়া উঠিত, অমনি চকিতে নিজের নিকট হইতে নিজে পলাইয়া বাঁচিত। রমেশ জানিল না যে রমেশকে আঘাত করিয়া রমা নিজে কতখানি ব্যাথা পাইয়াছিল। বিশেষতঃ সে আঘাত আসিয়াছিল বিশ্বাসের মূল হইতে। সুতরাং আঘাতের বেদনা উভয়েরই অত্যন্ত তীব্র। অব্যক্ত বেদনাম্লান রমার সে করুণ অত্মপ্রকাশ শরৎ সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

শরৎ সাহিত্যে পতিতা নামক গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ গৃহীত।

শরৎচন্দ্র

নরেন্দ্র দেব

'Veni, Vidi, Vici,'. I came, I saw, I conquered।

শরৎচন্দ্রের মুখ থেকেও যদি সীজারের মতো একথা বেরুতো তা একটুও অসত্য হত না।

'যমুনা' পত্রিকায় যেদিন 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হল, মুগ্ধ পাঠকেরা বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি শুরু করেছিলেন, কে এই শক্তিশালী লেখক? কোথায় ছিলেন ইনি এতদিন?

বাংলার সাহিত্যাকাশে সেদিন মধ্যাহ্ন রবির প্রখর প্রতিভা-কিরণ ঝলমল করছিল। সহসা সে আকাশে উদয় হল এ কোন নবজ্যোতিষ্ক? এর দ্যুতি তো সকলের দৃষ্টী আকর্ষণ করছে!

সাহিত্য-লক্ষ্মীর অমরাবতী থেকে যাঁরা নেমে আসেন আমাদের প্রাণ-পাত্রটি রসের অমৃতধারায় পূর্ণ করে দিতে, তাঁরা চিরদিন আমাদের কাছে অবিস্মরণীয়। তাঁদের অক্ষয় সৃষ্টিনৈপুণ্যে যে অবিনশ্বর স্মৃতি-মন্দিরটি গড়ে ওঠে তা কালজয়ী।

'যমুনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ের ছ-সাত বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি বড়। তিন সংখ্যায় ক্রমশঃ ছাপা হয়। প্রথম ছ' সংখ্যায় নাম ছিল না লেখকের। সেদিনের পাঠক সমাজকে এ গল্পটিও বেশ একটু চঞ্চল করে তুলেছিল। কারণ সেদিন বাংলা সাহিত্যে সে রকম

উৎকৃষ্ট রচনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কারুর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। লেখকের নামটা অদম্য কৌতূহল তাই সবার মনেই দেখা দিয়েছিল। তাঁরা মনে মনে একরকম স্থির করেই ফেলেছিলেন যে, নাম নাই থাক, এ নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথের রচনা।

কিন্তু 'ভারতী' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় যখন 'বড়দিদি' গল্পটির লেখকের নাম প্রকাশিত হল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁরা কেউ এই অজ্ঞাতনামা লেখকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, কোনও নূতন লেখকের পক্ষে 'বড়দিদি'র মতো এত ভাল গল্প লেখা অসম্ভব। এ নিশ্চয় বেনামীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন। 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামটি সেদিন মিথ্যা হায় গেল।

এই ঘটনার ছ-সাত বছর পরে আবার যখন সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাম স্বাক্ষরিত 'রামের সুমতি' গল্পটি প্রকশিত হল, রসিক সমাজে একটা বিস্ময়ের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। এইবার অবহিত হলেন তাঁরা। তাই তো, তবে তো সত্যই এসেছে এমন একজন অমিতপ্রতিভাধর সাহিত্যস্রষ্টা যাঁর অসামান্য জ্যোতি রবি-দ্যুতির দীপ্ত প্রভার মধ্যেও আপন ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র আটচল্লিশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যের আকাশে একই সঙ্গে সূর্য-চন্দ্রের উদয়-রূপ এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। আমরা তখন নবীন যুবক। সাহিত তীর্থের নূতন যাত্রী। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিমুগ্ধ পূজারী ছিলুম আমরা। তখনও কিন্তু বাংলা দেশে এমন মূঢ়ের অভাব ছিল না যাঁরা রবীন্দ্র-বিদূষণে তৎপর ছিলেন। আমাদের ন্যায় নগণ্য রবীন্দ্র-ভক্তদেরও তাঁরা বিদ্রূপ করতেন।

আমরা তাই একটা মস্তবড় সন্তনা ও গৌরব অনুভব করেছিলুম যখন জানতে পারলুম, যাঁর রচনা-সম্ভার বাংলা-সাহিত্যে আগামী-

কালের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে সেই অসামান্য শক্তিশালী লেখক শরৎচন্দ্র একজন রবীন্দ্র-ভক্ত।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য সাধনা শুরু করেছিলেন। অতি গভীর গোপন ছিল তাঁর সে তপস্যা। তিনি যখন ছাত্র মাত্র সেই সময় থেকেই তাঁকে ঘিরে ভাগলপুরে একটি তরুণ সাহিত্যগোষ্ঠি গড়ে উঠেছিল। এই তরুণের দলে যাঁরা ছিলেন শরৎচন্দ্রের অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্য উত্তরজীবনে তাঁরা সকলেই এক-একজন সুলেখক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। একখানি হাতে লেখা পত্রিকাতেই তাঁরা প্রথম হাত পাকিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের উপদেশে ও নির্দেশে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন একলব্যের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ভক্ত শিষ্য। তাঁকেই বলতেন তিনি সাহিত্য সাধনায় তাঁর স্বনির্বাচিত গুরু রবীন্দ্র রচনাই ছিল তাঁর আদর্শ। ষোলো বছর বয়স থেকে ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্র অসংখ্য গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যে সময় তাঁর জীবন ছিল এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে তখনও সাহিত্য রচনা থেকে তিনি বিরত হননি। সে সব রচনার কিছু কিছু আজও আছে, আর অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। কিন্তু একটি রচনাও তিনি কখনো কোনও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাননি। তাঁর কঠিন সংকল্প ছিল, যতদিন না, রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে পারবো ততদিন কোন রচনা প্রকাশ করবো না।

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে তার এক বন্ধু 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন। গল্পটি তার কাছেই বহুদিন থেকে পড়েছিল। শরৎচন্দ্র সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় তার গল্প প্রকাশের খবরও তিনি জানতেন না এবং সংবাদও তার কাছে পৌঁছয়নি যে তার সে রচনাকে সমঝদার পাঠকেরাও রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেই ভুল করেছিলেন।

বছর দুই পরে নিতি যখন রেঙ্গুন থেকে অল্পদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন, সেই সময় তার কাছে এই শুভ সংবাদ পেৌছেছিল। সেদিন তিনি প্রথম জানতে পারেন, তার সংকল্প তার সাধনা, তার সাহিত্য-জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। তখন তপোসিদ্ধ সাধকের পরমানন্দে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এর পর থেকেই তিনি অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে 'যমুনা' পত্রিকাকে তার অনুপম রচনা সম্ভারে প্লাবিত করে দিয়েছিলেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালে। এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধে ও আগ্রহাতিশয্যে 'ভারতবর্ষে'ও তার রচনা দিতে শুরু করেন এঁরাই শরৎচন্দ্রকে আশ্বাস ও ভরসা দিয়ে রেঙ্গুনের সরকারী কাজ ছাড়িয়ে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

অতি বিচিত্র এই মানুষটির জীবন। ততোধিক বিচিত্র তার জীবনের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। মানব সমাজের সকল স্তরের নর-নারীর অন্তরের সুখ-দুঃখ- আনন্দ-বেদনার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ঘটবার সুযোগ ইতিপূর্বে বাংলাদেশেয় আর কোনও লেখকের ভাগ্যে ঘটেছিল কিনা জানিনা। শরৎচন্দ্রকে অল্প বয়স থেকেই ভাগ্যবিড়ম্বনায় নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। তার সেই পথের বিচিত্র সঞ্চয়ই কালক্রমে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অমূল্য রত্ন হয়ে উঠেছিল।

শরৎচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই হ'য়ে উঠেছিলেন সাহিত্য-লক্ষ্মীর রত্নশালার একজন সুদক্ষ মণিকার। অনাদি অনন্ত রহস্যময় এই মানব জীবনের গহন গভীরে, তার অতল অন্তরতলে কতনা অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত মণি-মাণিক্য শুক্তির মধ্যে মুক্তার মত লুকিয়েছিল, শরৎচন্দ্র সেগুলিকে আহরণ করে এনে আপন অসামান্য শিল্প নৈপুণ্যের গুণে ফুটিয়ে তুলেছেন তার প্রত্যেকটির মধ্যে দুর্লভ কৌস্তুভচ্ছটা।

শিল্পীর দরদী মনের ছোঁয়া লেগে তার হাতের তুলির রঙে-রেখায় আঁকা ছবি যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলিও তার যাদু লেখনীর স্পর্শে তেমনি একেবারে যেন রক্ত-মাংসে ও প্রাণসম্পদে সজীব হয়ে উঠেছে আমাদের সামনে। বাস্তব জীবনের সত্যানুসরণে' আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট আলোকে তিনি এদেশে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। সমালোচকেরা কেউ বলেন, শরৎচন্দ্রের রচনা 'বাস্তব' সাহিত্যের কোঠায় পড়ে। আবার কারুর মতে শরৎচন্দ্রের রচনা একেবারেই 'রোমান্টিক' বা নন্দন-সাহিত্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যানুসরণে সাহিত্য রচনা করলেই কি তা হয়ে উঠবে বাস্তব সাহিত্য? না, স্থূল বস্তুতন্ত্র যে রচনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে তাকেই বলবো আমরা বাস্তব-সাহিত্য? বাস্তব সাহিত্য বলতে কি তবে আমরা বুঝবো, সেটা মানব জীবন ও সমাজের নিখুঁত ফটোগ্রাফ মাত্র অথবা, শিল্পীর তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা নিসর্গ দৃশ্যের এক-একখানি হুবহু নকল প্রতিকৃতি।

নর-নারীর পূর্বরাগ-প্রেম-বিরহ-মিলনাদি হৃদয়ঘটিত কারবার নিয়ে তাতে কবি-কল্পনার রংয়ের সুষমা মাখিয়ে যে বর্ণ-বৈচিত্র্যময় রম্য-রচনা সৃষ্টি হবে সেই কি রোমন্টিক সাহিত্য?

শরৎ-সাহিত্যের সমালোচকগণকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে তারা ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যটিকে সমাধিক দেখতে পান? আমার মনে হয় বস্তুতান্ত্রিক সমালোচকেরাই শরৎচন্দ্রের রচনাকে তাদের চশমা দিয়ে দেখে 'বাস্তব-সাহিত্যে' বলেই রায় দেবেন, আর কল্পনাপ্রবণ সমালোচকেরা তাঁর রচনার মধ্যে রোম্যান্সের গন্ধ পেয়ে 'রোমান্টিক সাহিত্য' বলেই ফতোয়া জাহির করবেন। ফলে এই দোটানায় পড়ে মুস্কিল হয়ে পড়বে শরৎ-সাহিত্যের জাতি নির্ণয় করা। গবেষকদের

পক্ষেও এবং সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও। অবশ্য পাঠকেরা অধিকাংশই কোনো রচনার জাতবিচার নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁদের ভাল লাগা-নালাগা দিয়েই তাঁরা সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করেম। সে যাইহোক, জটিলতার এইখানেই শেয় নয়। কেউ কেউ বলেন. শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী-সাহিত্যিক! কেউবা বলেন. তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী সমাজ সংস্কারক। আবার কারুর মুখে শুনি যে তিনি ভীরু রক্ষণশীল। বিদ্রোহের সাহস ছিল না তার। কারুর মতে তিনি দুর্নীতির প্রচারক। এমন কি শরৎ-সাহিত্যকে অশ্লীল বলতেও কোনও কোনও বিকৃত রুচি ও শুচিবায়ুগ্রস্ত সমালোচক ইতস্ততঃ করেননি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একদফা শরৎ-সাহিত্যের জাতি বিচার নিয়ে সমস্যা, দ্বিতীয়, তাঁর রচনার মধ্যে কোন মতবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে, সেটা নির্ণয় করাও এক সমস্যা। উভয় সমাধানই আপাতদৃষ্টিতে কঠিনসাধ্য বলে মনে হলেও, শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন যাঁরা তাঁহাদের কাছে এ সত্যটা ধরা পড়বেই যে শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ হল মানসলোকাশ্রিত মানবধর্ম! শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর রচনার মধ্যে নানা স্থানে নিজের আদর্শবাদ ও মতবাদ বেশ সুস্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে আর কোনও স্বার্থক উক্তি নেই। শরৎচন্দ্রের নিজের কথাগুলি যাঁরা যত্ন করে বেছে বেছে টুকে রাখবেন, শরৎ সাহিত্যের বিচিত্র ভাবধারা মধ্যে তাঁদের আর দিশেহারা হতে হবে না।

শরৎ সাহিত্যের স্বরূপ অনুসন্ধানীদের একটা কথা মনে রাখতে বলবো যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বিচারে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে পৃথক করে দেখা চলে না। শরৎচন্দ্র সংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষ নন। মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধই শরৎচন্দ্রের প্রাণবায়ু। শরৎ সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর এই সমবেদনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব সমাজের বিভিন্ন

স্তরের কয়েকটি নর-নারীর চরিত্র অবলম্বনে তিনি মানুষের মনের যে গভীর গোপন রহস্যকে আমাদের কাছে সুকৌশলে উন্মোচন করে ধরছেন তাঁর মধ্যে আমরা যেন আমাদেরই আপন প্রাণস্পদন অনুভব করি। সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের যে তীক্ষ্ণ অনুভূতির বিচিত্র লীলা আমাদের শিরা-উপশিরার মধ্যে সঞ্চারিত শোণিত প্রবাহের মতো নিঃশব্দে বহমান, যার বিভিন্ন তরঙ্গ আমাদের নিভৃত নির্জন তটভূমিতে এসে আঘাত করে—কখনো নিষ্ঠুরের মতো, কখনো স্নেহকোমল কল্যাণ সুখের মতো তারই অধীর আবেগকে তিনি যে শিল্পীর সুক্ষ্ম আবেদনের ন্যায় মর্মস্পর্শী মন্ত্রে প্রকাশ করেছেন, শরৎ-সাহিত্যে সেই কৃতিত্বেই আজ মহান সার্থকতা লাভ করেছে।

শরৎ সাহিত্যের মধ্যে শরৎচন্দ্রের জীবন ও অভীজ্ঞতা যতই জড়িত থাক না কেন, শিল্পী শরৎচন্দ্র কিন্তু সুদক্ষ কারু কৃতীর মতই নিজেকে তার মধ্যে এমনভাবে বিলুপ্ত করে দিতে পেরেছেন যে তাঁর রচনার মধ্যে ব্যক্তি-শরৎচন্দ্রকে সহজে খুঁজে বার করতে পারা যাবেনা। রাজলক্ষীর বাল্য সাথী ও পিয়ারী বাঈজীর অনুগ্রহ ধন্য মেরুদণ্ডহীন দুর্বল প্রকৃতি শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে যাঁরা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের সে প্রয়াস-ব্যর্থ হতে বাধ্য। শ্রদ্ধেয় হিরন্ময়ী দেবীর আড়ালে যাঁরা রাজলক্ষ্মীর ছায়ার সন্ধান করবেন তাঁদের হতাশ হতে হবে।

শরৎচন্দ্রের সর্বহারা জীবনের নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় প্রতিফলিত, একান্ত সুপরিচিত অসংখ্য বিভিন্ন চরিত্রের কাটামোর মধ্যে তাঁর নিজের ব্যাক্তি-জীবনের কিছু কিছু ছায়া কোথাও অল্প-স্বল্প উঁকি মারলেও তার সবটাই যে তিনি নন এবং সবটুকুই যে অনাবৃত সত্য নয় এটা সমালোচকদের মনে রাখতে হবে। শরৎচন্দ্র যে মানুষটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, যার

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁক বিস্মিত করেছে, যাঁর অনন্যসাধারণ আচরণ তাঁকে আনন্দ দিয়েছে সেই নারী বা পুরুষের একটি অবিস্মরণীয় প্রতিমূর্তি গড়বার সময়, তিনি সেই বাস্তব মানুষটিকে সত্যের বেদীতে বসিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সহনাভূতির সঙ্গেই রচনা করেছেন। তাই তারা এ সত্য এত জীবন্ত হয়ে উঠেও আমাদের সমগ্র চিত্তকে একটা আশ্চার্য রমণীয়তার পরিবেশে জয় করে নেয়। শরৎ সাহিত্যের মধ্যে রিয়েলিজম্ ও রোম্যান্টিসিজ্মের এই যে হারমোনিয়াস্ সমন্বয়, শরৎ সাহিত্যের এইটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরা বাস্তবও নয়, কল্পনাও নয়, এরা শক্তিশালী শিল্পীর সত্যানুসারী অভিনব সৃষ্টি।

আধুনিক কথা-শিল্পে বাৎসল্যরসের অনুপম প্রকাশ শরৎ-সাহিত্যের আর এক উপভোগ্য ঐশ্বর্য। তিনি আমাদের কাছে শুধু প্রিয়সুখভাগিনী নব অনুরাগিনীদের এনেই হাজির করেননি, নারীর মহীয়সী মাতৃত্বের অপরূপ মূর্তিও আমরা শরৎ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। এর যেন আর তুলনা মেলে না।

শরৎ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দান বলা যেতে পারে এদেশের মেয়েদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। বাংলা দেশের মেয়েদের স্বাধীনসত্ত্বা বলে কিছু ছিল না। হিন্দুর স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্য তাকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনতা নির্বিচারে মেনে নিতে শিখিয়েছিল। মেয়েমানুষরাও যে 'মানুষ', সে যে শুধুই 'মেয়ে' নয়, এ বোধ বাংলার মেয়েদের মনে জাগ্রত করে তুলেছে শরৎ-সাহিত্য। এই self consciousness আত্ম-চেতনা মেয়েদের মধ্যে এনে দিয়েছে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট শক্ত-সমৃদ্ধ বিস্ময়কর নারী চরিত্রগুলি। মেয়েরাও যে মানুষের পূর্ণ অধিকার দাবী করতে পারে, তাদেরও যে একটা পৃথক অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাদেরও

যে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ, রুচি, অরুচির বালাই থাকতে পারে আমাদের সমাজ সে কথা একেবারেই ভুলে গেছলো। শরৎচন্দ্রের রচনা আমাদের শুধু সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়নি, তিনি মেয়েদের স্বীয় অধিকারে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবার পথও নির্দশ করে গেছেন। বাংলা দেশের এ যুগের মেয়েরা শরৎচন্দ্রেরই আবিষ্কার করে যাওয়া তেজস্বিনী, আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যাশীলা সরলা নারী, যাঁরা নিজেদের ভাল-মন্দের ভার নিজেদেরই হাতে নিতে সক্ষম। অসহায় বিপন্ন পুরুষেয় দুর্বল অন্তরে যারা নির্ভরতার সাহস ও কর্মোদ্যম জাগিয়ে তুলতে পারে।

মানুষের মধ্যে তিনি দেবতার অস্তিত প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই পাপকে ঘৃণ্য করলেও পাপীকে ঘৃণ্য করতে পারেননি। শরৎচন্দ্রের মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ উদার অন্তরে পদস্খলিত উদভ্রান্ত নর-নারীর জন্য ছিল অসীম করুণা ও সহানুভূতি। চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকা সম্ভব সহৃদয় শরৎচন্দ্রের উন্মুখ দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের সেই অপ্রকাশিত দিকটা যেমন করে ধরা পড়েছে এমনটি আর আগে কোথাও পাই না। মানব মানের প্রচ্ছন্ন কোণের গোপন খবরগুলি এই অকৃত্রিম মানব-সুহৃদের অগোচর ছিল না।

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বলবার আছে কিন্তু এ স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে তার স্থান হবে না সুতরাং আমি শুধু দু-একটি কথা বলেই এর উপসংহার করছি। শরৎচন্দ্র কোনওকালেই বিপ্লবী সাহিত্যিক নন, সমাজ-বিদ্রোহী লেখকও নন। শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে কোথাও এর এতটুকু প্রমাণও পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমাদের আজও প্রচলিত প্রাচীন সমাজে ভিতয়ে ভিতরে যে ঘুণ ধরে গেছে, আমাদের সমাজপতিরা যে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছেন, এ জাতিকে বাঁচতে হলে যে এদিকে

তাদের অবহিত হতে হবে এর একটু ইঙ্গিত মাত্র তাঁর অধিকাংশ সামাজিক সমস্যমূলক রচনাগুলিতে পাওয়া যায়। সমস্যা তিনি উপস্থিত করেছেন বটে একাধিক, কিন্তু কোনওটিরই সমাধানের পথ দেখতে সাহস করেননি। এটা তাঁর ভীরুতা নয়, বরং একটু রক্ষণশীলতারই লক্ষণ একথা বলাই বাহুল্য।

শরৎচন্দ্রকে আমরা আর যে অপবাদই দিই না কেন, তিনি যে দুর্নীতির সমর্থক এবং তাঁর রচনা যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, এর চেয়ে মিথ্যা হতে পারে না আর কিছু। শরৎচন্দ্র অতি সাবধানী ও সতর্ক লেখক। কোথায় যে থামতে হবে এটা তিনি খুব ভালই জানেন। জাহাজের কেবিনে দিবাকর ও কিরন্ময়ীর রাত্রি যাপনের দৃশ্য থেকে। বুঝতে পারা যায় কতটা পর্যন্ত গেলে রচনা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হবে না, এ জ্ঞানটা তিনি জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কখনো হারিয়ে ফেলেননি। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে তিনি কোথাও দুর্নীতি ও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেননি।

এই লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন সুধানাগ।

দরদী শরৎচন্দ্র

সুরেন্দ্রনাথ মাঝি

আমি শরৎবাবুকে ১৯০৮ ইংরেজী হতেই জানতাম। এমন কি এক বাড়ীতে বাস করেছি। আমি ছিলাম তাঁর দোসার, যদিও তিনি কীর্তনের পদাবলী ও সুর যোজনা করতে পারতেন, কিন্তু গাইতে চাইতেন না।

যেদিন তিনি সংকীর্তনের খবর পেতেন এমন কি চিঠিও পেতেন, তিনি ডাকতেন ওহে সুরেন শীঘ্রই তৈরী হয়, সংকীর্তনে যেতে হবে, চিঠি এসেছে—।

নিজের ঘরেও কীর্তন বাদ যেত না।

আমাদের দস্তুর মত এদটা সংকীর্তনের দল ছিল। দোল, চাঁচর ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার উৎসব শরৎবাবুর কাছে কিছুই বাব যেত না। এই প্রকারের পাঁচ সাত বছর চলাফেরার পরে রেঙ্গুনে বর্মা অয়েল কোম্পানির কারখানা হতে আমার চাকরী গেল। আমার দু'চারজন বন্ধু তখন বর্মার গোল্ড মাইনে চাকরী করছিল। ক্রমান্বয়ে চিঠি পত্রের চালা-চালিতে, হঠাৎ এক বন্ধুর চিঠি পাওয়া গেল, নামটু গোল্ড মাইতে গেলে চাকরী হতে পারে।

দু'চারদিন পর শরৎবাবু খবর পেলেন। তিনি বললেন, তুমি নামটুতে চলে যাও, এখানে তোমার কোন সুবিধা হবে না।

তখন আমি কর্পদহীন।

এমন কি বেণীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার আছে একশ টাকা পেতেন।

আবার দু'চার দিন পরে শরৎবাবু বললেন, কি হে সুরেন তোমার নামটু যাবার কি হল।

আমি আর গোপন করতে পারলাম না।

বললাম, দাদাঠাকুর যাই কি করে? একটা পয়সা নেই,— হোটেলের খোরাকীর টাকা বাকী, আবার বেণীবাবু পাবেন একশ টাকা।

শরৎবাবু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আর কোন কথা বললেন না।

পর দিবস আমায় ডেকে বললেন, সুরেন এদিকে এসো।

আমি তখন সামনে যেতে বললেন, রেঙ্গুন হতে নামটু যাবার রাস্তা জান? প্রথমতঃ ম্যাণ্ডেলের মেল গাড়ীতে উঠে তোমাকে ম্যাণ্ডেল নামতে হবে। উঠতে হবে লাসিংএর গাড়িতে। লাসিং যেতে পথে পাবে লামিও ষ্টেশন। সেই ষ্টেশনে নেমে রাত্রে ষ্টেশনে থাকতে হবে। পরদিন সকালবেলা পাবে মাইনের গাড়ি।

যদিও প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে না বটে, তবুও তোমার বন্ধুর চিঠি দেখালেই নিয়ে যাবে। খরচ পড়বে প্রায় গাড়ি ভাড়া সহ পনের টাকার মতনই। টাকাটা আমি দিচ্ছি, তুমি আর দেরী না করে দু' একদিনের মধ্যেই বের হয়ে পড়।

আমি বেণীবাবুর টাকার কথা বলতেই, তিনি বললেন সে টাকার বিষয় তোমাকে ভাবতে হবে না। তার জবাব আমি দেবো। যাচ্ছ শীতের দিন, সেখানে শীত খুব বেশী। জামা কাপড় দরকার হলে অমাকে চিঠি দিও। দেখি কলে কটায় ট্রেন ছাড়ে।

পরদিবস সকাল বেলায় শরৎবাবু বই দেখে আমায় বলে দিলেন। এমন কী যাবার খরচের টাকাটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন।

আমি আর কোন কথা না বলে ছুটোর গাড়িতে নানটু চলে গেলেন আজও সেই মহাত্মার কৃপায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে কাল যাপন করছি। শরৎবাবু আমায় শুধু ভাবে দেখেননি।

আমরা যেমন দেখেছি এক দিকে বন্ধু, অপর দিকে আত্মীয়, তিনি একদিকে ছিলেন পরপোকারী, অপরদিকে ছিলেন মহৎ উদার।

একদিকে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অপর দিকে ছিলেন দেবতা…